KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৩৮/১ রেসিডেন্সি স্ট্রিট, কলকাতা
Collection : KLMLGK	Publisher : প্রমথ চৌধুরী
Title : সবুজপত্র (Sabuj Patra)	Size : 7.5" x 6"
Vol. & Number : 4/1 4/2 4/3 4/4 4/5	Year of Publication : বৈশাখ ১৩২৪ শ্রাবণ ১৩২৪ আশ্বিন ১৩২৪ কার্তিক ১৩২৪ পৌষ ১৩২৪
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : প্রমথ চৌধুরী	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

৪৩২৪

বৈশাখ, ১৩২৪।

সবুজ পত্র

বাংলা সাময়িক পত্র পাঠাগার ও গবেষণা কেন্দ্র

সম্পাদক

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী এম্, এ, বার-য়্যাট-ল

বাংলা সাময়িক পত্র পাঠাগার ও গবেষণা কেন্দ্র

বার্ষিক মূল্য দুই টাকা ছয় আনা।
সবুজ পত্র কার্য্যালয়, ৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

কলিকাতা।
৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট।
শ্রীপ্রমথ চৌধুরী এম্, এ, বার-য়্যাট-ল কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা।
উইক্‌লী নোট্‌স্ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,
৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট।
শ্রীসারদা প্রসাদ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

বর্ণানুক্রমিক সূচী।

(বৈশাখ—ভাদ্র)

বিষয়		পৃষ্ঠা
অহল্যা	বীরবল ...	২২৮
অচলায়তন	সুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ...	৩০০
একটি ঘটনা	প্রবোধ ঘোষ ...	৯৪
কৌতুকময়ী	সুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ...	১৯৫
কথা ও সুর	প্রমথ চৌধুরী ...	২১০
জাপানের কথা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৪২
টী-পার্টি	হারিতকৃষ্ণ দেব ...	১০৫
তপস্বিনী	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	১১৮
দুখানি চিঠি	" " ...	২৩৩
ধরতাই বলি	ধূর্জ্জটী প্রসাদ মুখোপাধ্যায় ...	৯৭
নূতন ও পুরাতন	সুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ...	২৪৮
পয়লা নম্বর	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	১৭১
পরমায়ু	" " ...	৯২
প্রাণের কথা	প্রমথ চৌধুরী ...	১৯৯
বর্ত্তমান সাহিত্য	বরদা চরণ গুপ্ত ...	৩৩
বৈজ্ঞানিক ইতিহাস	অতুল চন্দ্র গুপ্ত ...	৬৫
বাঙ্গলা ভাষার কুলের খবর	প্রমথ চৌধুরী ...	২১৬
ভাষার কথা	নলিনীকান্ত ভট্টশালী ...	৫৩
ঐ	সুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ...	৮০

মন্তব্য	প্রমথ চৌধুরী	...	...	৫৭
ঐ	" "	...	...	৮৭
মুখরক্ষা	সতীশ চন্দ্র ঘটক	...	...	১৩৯
লিখিবার ভাষা	প্রমথ চৌধুরী	...	...	১৭
শিক্ষা-সমস্যা	প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়	...	...	৩১২
সম্পাদকের কৈফিয়ৎ	প্রমথ চৌধুরী	...	...	৩
সাহিত্যের সার্থকতা	বীরবল	...	...	৭
সংস্কৃতের প্রভাব ও অনুবাদ সাহিত্য	দয়াল চন্দ্র ঘোষ	...	...	১৫৫
সঙ্গীতের মুক্তি	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	...	২৫৫
স্বামী-স্ত্রী	বরদা চরণ গুপ্ত	...	...	২৮৭

সম্পাদকের কৈফিয়ৎ।

গত বৎসর সবুজ পত্র আমি দস্তুরমত চালাতে পারি নি, এর জন্য ও পত্রের গ্রাহকসমাজের কাছে একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া আবশ্যক মনে করি। ছাপার ভুলকে আমি তেমন মারাত্মক দোষ বলে মনে করি নে,—কেননা পাঠকমণ্ডলী ও ভুল নিজগুণেই অনায়াসে সংশোধন করে নিতে পারেন।

কিন্তু সবুজ পত্র যে, শেষ ছমাস ঠিক মাসে মাসে বেরয় নি, এইটেই হয়েছে তার মহাত্রুটি। শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় তারিখের শাসন না মানবার পক্ষে নানা যুক্তি দেখিয়েছেন,—কিন্তু সে সব যতই সুযুক্তি হোক না কেন, তদনুসারেই যে ফাল্গুনের পত্র চৈত্রে এবং চৈত্রের পত্র বৈশাখে বেরিয়েছে, এ কথা বল্‌লে ঠিক কথা বলা হবে না। রায় মহাশয়ের সুমুখে অনেক সময় পড়ে আছে, সুতরাং সে সময়ের তিনি ঢিলেঢালা ভাবে ব্যবহার কর্‌তে পারেন, এবং তাঁর পক্ষে তা করাই স্বাভাবিক, কেন না দিনগোনা যৌবনের ধর্ম্ম নয়। অপরপক্ষে এ পৃথিবীতে আমাদের কাজের সময় সংক্ষেপ হয়ে আস্‌ছে—সুতরাং আমাদের পক্ষে সময়ের একটা হিসেব করে চলা আবশ্যক, অর্থাৎ আমরা তারিখের শাসন মান্‌তে বাধ্য। আমরা যে এ ক্ষেত্রে সে শাসনের নিয়ম লঙ্ঘন করেছি, তার একমাত্র কারণ—সে নিয়ম রক্ষা করা আমাদের পক্ষে সব সময়ে সম্ভবপর হয় নি।—

কলম চালানো আমার সখ, কাগজ চালানো আমার ব্যবসা নয়। এর প্রমাণ, ব্যবসায়ীর হাতে পড়্‌লে সবুজ পত্র হয় এতদিনে বন্ধ হয়ে যেত, নয়ত তার চেহারা বদলে যেত। অব্যবসায়ীর হাতে পড়েছে বলে, সবুজ পত্র আজও প্রকাশিত হচ্ছে, এবং সেই একই কারণে তা অকালে প্রচারিত হচ্ছে। এই কালবিলম্বের জন্য আমরা অবশ্য লজ্জিত আছি, তবে সেই সঙ্গে এ বিশ্বাসও আমাদের আছে যে, এ পত্রের গ্রাহক এবং অনুগ্রাহকেরা আমাদের কাছ থেকে কোনও দস্তুরমাফিক জিনিস পাবার বিশেষ প্রত্যাশা রাখেন না।

গত বৎসরের শেষাশেষি সবুজ পত্রের যে কখন কখন পঁয়ত্রীশ দিনে মাস হয়েছে—তার আরও একটি কারণ আছে। সবুজ পত্রের বিরুদ্ধে নানারূপ বদনাম থাকা সত্ত্বেও তার একটি বিশেষ সুনাম আছে। জনরব যে এ পত্রের সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের বেনামদার। এ প্রবাদটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য না হলেও, প্রকৃতপক্ষে মিথ্যা নয়। সকলেই জানেন যে প্রথম দু বৎসর রবীন্দ্রনাথের লেখাই ছিল—কি ওজনে, কি পরিমাণে—এ পত্রের প্রধান সম্পদ।—সবুজ পত্র বাঙ্গলার পাঠকসমাজে যদি কোনরূপ প্রতিষ্ঠা ও মর্য্যাদালাভ করে থাকে ত সে মুখ্যতঃ তাঁর লেখার গুণে। সুতরাং গতবৎসরের আরম্ভেই তিনি যখন সমুদ্রযাত্রা কর্‌লেন, তখন জলে পড়্‌লুম আমি!

রবীন্দ্রনাথের সাহায্য ব্যতীত আমি যে এ কাগজ চালাতে পারব, এ ভরসা আমার আদপেই ছিল না। আমার ক্ষমতার সীমা আমি জানি। সুতরাং মাসের পর মাস একখানি করে গোটা সবুজ পত্র আমার পক্ষে একহাতে গড়ে তোলা যে অসম্ভব,—এ জ্ঞান আমি কখনই হারাই নি। আর যদি আমি এ কাগজ চালাবার সম্পূর্ণ ভার নিজের হাতে নিতে

উদ্যত হতুম, তাহলে সমালোচকেরা আমার কাণ্ডজ্ঞানহীনতার বিষয় আমাকে স্মরণ করিয়ে দিতে তিলার্দ্ধ বিলম্ব কর্‌তেন না। এ ত গেল লেখার কথা। তারপর আসে পরের লেখার সম্পাদনের কথা; সে বিষয়েও আমার কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না, কেননা সবুজ পত্রের সম্পাদককে ও কাজের বালাই নিয়ে বড় একটা ভুগতে হয় নি। প্রথমতঃ, রবীন্দ্রনাথের লেখার উপর হস্তক্ষেপ করবার অধিকার পৃথিবীর কোন দেশের কোন সম্পাদকেরই নেই—দ্বিতীয়তঃ, আমার নিজের লেখার উপর হস্তক্ষেপ করবার অধিকার আমার চিরদিনই ছিল,—কিন্তু সে লেখক হিসেবে, সম্পাদক হিসেবে নয়। এই কারণে গত বৎসর আমি সবুজ পত্র বন্ধ করে দেবারই পক্ষপাতী ছিলুম। শেষটা কিন্তু যাঁর অভিপ্রায়মত সবুজ পত্র প্রকাশ করা হয়, তাঁরই ইচ্ছামত ও পত্র বাঁচিয়ে রাখ্‌তে আমি প্রতিশ্রুত হই। আমি বেশ জানতুম যে, রবীন্দ্রনাথ যে দেশেই থাকুন, বাংলার মায়া তিনি কাটাতে পার্‌বেন না,—এবং সবুজ পত্র তাঁর প্রতিভার প্রসাদ লাভে বঞ্চিত হবে না। এ আশায় আমি নিরাশ হই নি। প্রথম ছ'মাস তিনি নিয়মিত সবুজ পত্রের খোরাক জুগিয়েছেন। তার পর থেকেই সবুজ পত্র, অসাময়িক পত্র হয়ে ওঠে। এ অবস্থায় যে ও কাগজ আমরা টিঁকিয়ে রাখ্‌তে পেরেছি, এতেই আমরা নিজেদের কৃতার্থ মনে করি।—দু'দিন পরে হলেও সবুজ পত্র যে মাসের পর মাস সশরীরে দেখা দিয়েছে, সে সবুজ পত্রের নবীন লেখকদের গুণে। তাঁদের একান্ত সহানুভূতি ও আনুকূল্য ব্যতীত, আমার পক্ষে সবুজ পত্র চালানো অসম্ভব হত। যখন সবুজ পত্রের উপর চারিদিক থেকে আক্রমণ চলছিল, যখন

বান্ধবেরাও আমাদের প্রতি বিমুখ হয়ে ছিলেন, তখন যে যুবকের দল কায়মনোবাক্যে আমাদের সহায়তা করেছেন, তাঁদের প্রতি এই সুযোগে আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর্‌ছি। সবুজ পত্রের প্রতি এঁদের প্রীতির মূল্য আমার কাছে যে এত বেশী, তার কারণ এ প্রীতির মূলে এক সাহিত্যের সম্বন্ধ ছাড়া অপর কোনও সম্বন্ধ নেই। এ স্থলে এঁদের নাম উল্লেখ করা অনাবশ্যক, কেননা সবুজ পত্রের পাঠকমাত্রেরই নিকট এখন তাঁরা নামে পরিচিত। মনের ভাব স্পষ্ট কথায় ব্যক্ত করবার সংকল্প ও শক্তি এঁদের সকলেরই আছে, সুতরাং এঁদের হাতে যে বঙ্গ-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হবে, সে বিষয়ে আমার মনে কোনও সন্দেহ নেই। সুতরাং আশা করি সাহিত্য-চর্চ্চার সখটা এঁরা কোন কালেই ত্যাগ কর্‌বেন না।

রবীন্দ্রনাথ আবার স্বদেশে ফিরেছেন, সুতরাং সবুজ পত্রের সকাল-মৃত্যুর বিশেষ সম্ভাবনা নেই; অতএব এ কথা আমি অনেকটা ভরসা করে বল্‌তে পারি যে, ভবিষ্যতে আমরা তারিখের শাসন মেনে চল্‌তে না পারলেও, মাসের শাসন সম্ভবতঃ লঙ্ঘন কর্‌ব না।

সাহিত্যের সার্থকতা।

—:০:—

প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অক্ষয় চন্দ্র সরকার মহাশয় সাহিত্যের আসরে মুখ খুললেই ম্যালেরিয়ার কথা তোলেন,—অমনি নবীন সাহিত্যিকদের দলে হাসির গর্‌রা পড়ে যায়। এ হাসির কারণ কি,—তা একটু তলিয়ে দেখা দরকার। ম্যালেরিয়া যে এদেশে আছে, এবং ও পাপ দূর না হলে দেশের যে মঙ্গল নেই—এ কথা এক পাগল ছাড়া আর কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। আর নবীন সাহিত্যিকদের সকলেরই যে মাথা খারাপ, এ কথা বল্‌লে একটু বেশী বলা হয়। সুতরাং ধরে নেওয়া অন্যায় হবে না যে, নবীনদেরও মস্তিষ্ক এবং হৃদয় ঠিক ঠিক জায়গায় আছে, আর সে হৃদয়ের মাপ ও সে মস্তিষ্কের ওজনও গড়পড়তায় যেমন হয়ে থাকে, তেমনি। এ সত্ত্বেও তাঁরা ম্যালেরিয়া দমনের প্রস্তাব শুনলে হাসেন কেন?—হাসেন এই কারণে যে, প্রস্তাবটা করা হয় সাহিত্যের আসরে। ম্যালেরিয়াকে অবশ্য হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, কিন্তু ও-বস্তুকে কেঁদেও ভাসিয়ে দেওয়া যায় না! তাই সরকার মহাশয় যখন এই নিয়ে করুণরসের অবতারণা করেন, তখন সভাস্থলে হাস্যরসের আবির্ভাব হয়। কেননা সকলেই জানেন—অন্ততঃ সকলের জানা উচিত যে, ম্যালেরিয়া কাব্যের বিষয় নয়; যদিচ ও-বস্তুর সংস্পর্শে স্বেদ, কম্প, মূর্চ্ছা, রোমাঞ্চ শীৎকার প্রভৃতি সাত্ত্বিকভাবের প্রধান লক্ষণগুলি সব মানুষের শরীরে দেখা দেয়! বাংলা দেশের ঘাড় থেকে ও ভূত নামানোও

সাহিত্যের কাজ নয়—কেননা কোনও সাহিত্যিক এ ব্যাপারের শান্তি-স্বস্ত্যয়নের মন্ত্র জানেন না। ফরমায়েস পেলে অবশ্য অনেক সাহিত্যিক বীররসাত্মক মশকবধকাব্য, অথবা রৌদ্ররসাত্মক জ্বরান্তক নাটিকা রচনা করতে পারেন—কিন্তু তাতে করে ম্যালেরিয়ার একটি কীটাণুও মারা যাবে না, লাভের মধ্যে শুধু সাহিত্যরাজ্যে ম্যালেরিয়া ঢুকবে। সরকার মহাশয় যখন প্রবীণ সাহিত্যিক—তখন সাহিত্যের এ অক্ষমতার কথা যে তিনি জানেন না, তা হতেই পারে না। সুতরাং আসলে তাঁর প্রস্তাব এই যে, সকলে মিলে আগে দেশের এই দুরবস্থা দূর করো, পরে অবসরমত আরামে সকলে মিলে সাহিত্যচর্চ্চা করা যাবে। দিনে কর কাজকর্ম্ম, গান-বাজনা হবে এখন রাত্তিরে,—ইতিমধ্যে যদি না সকলে ঘুমিয়ে পড়ো! আগে কাজ, পরে সখ। সাহিত্যচর্চ্চা যে একটা অকাজ—অন্ততঃ বাজে কাজ—এ ধারণা লক্ষ লোকের আছে। সরকার মহাশয়ের অপরাধ—তিনি মুখ ফুটে কথাটা শুধু বলেছেন, এবং সেই সঙ্গে ম্যালেরিয়ার দোহাই দিয়েছেন।

এর বদলে রাজনীতি কি সমাজনীতির দোহাই দিলে, বাঙ্গালী সাহিত্যিকরা তাঁর ভয়ে নিশ্চয়ই জড়সড় হয়ে যেতেন।

পৃথিবীর অধিকাংশ লোকে সাহিত্যের সৃষ্টি যে একটা অনাসৃষ্টি মনে করেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সচরাচর মানুষে, কথা ও কাজের ভিতর একটা প্রকাণ্ড প্রভেদ দেখে, এবং সেই সঙ্গে মনে করে যে, এর একটা হচ্ছে আর একটার উল্টো;—আর তাও যদি না হয় তাহলেও কাজের ওজন যে কথার ওজনের চেয়ে ঢের বেশী, সে বিষয়ে ও-মহলে বড় কারও মতভেদ নেই, এবং ভবের হাটে ওজন অনুসারেই বস্তুর মূল্য নির্ণয় হয়। রবীন্দ্রনাথের "সোণার তরার"

চাইতে একখানা রণতরীর মূল্য যে লক্ষগুণে বেশী, এ সত্য এত মোটা যে, পৃথিবীসুদ্ধ লোক তা না দেখে থাকতে পারে না। এর প্রতিবাদ করতে হ'লে বলতে হয় যে, প্রত্যক্ষ ও প্রমাণ এক জিনিস নয়; তাহলেই ওঠে ন্যায়ের তর্ক, আর সরল বুদ্ধির লোকের কাছে সে তর্ক হচ্ছে কূটবুদ্ধির বাগ্‌জাল, এবং সে জালে জড়িয়ে পড়তে অনেকেই নারাজ। অবশ্য সত্য কথা এই যে, কাজও এক রকমের কথা, আর কথাও বিশেষরকমের কাজ। কিন্তু এ সত্য হৃদয়ঙ্গম করা সকলের পক্ষে সম্ভবও নয়, দরকারও নেই। কথা মাত্রেই কাজ, আর কাজ মাত্রেই কথা হলেও, এর ভিতর অবশ্য ছোট বড়র প্রভেদ বিস্তর। মানুষের অনেক কথাই যে অকেজো, তা আমরা স্বীকার করি; কিন্তু মানুষের অনেক কাজই যে অকথ্য, একথা তাঁরা স্বীকার করেন না। সুতরাং বহুলোকে সাহিত্যিকদের হয় চুপ করে থাকতে উপদেশ দেন, নয় কাজের কথা কইতে আদেশ করেন। ফুলের গাছকে ফুল ফোটানো বন্ধ করতে উপদেশ দেওয়া, কিম্বা তাকে ফল ফলাতে আদেশ করা অবশ্য সুবুদ্ধির কার্য্য নয়—কেননা সে উপদেশ, সে আদেশ পালন করতে সে বেচারা নৈসর্গিক কারণে অসমর্থ। এ বিশ্ব ভগবানের সৃষ্টি, সুতরাং এতে এমন সব বস্তু আছে আর হয়—যা দু-সন্ধ্যে গেরস্থালির কাজে লাগে না। এ সবের উপর এই কারণেই সাংসারিক লোকের একটা আক্রোশ আছে,—সুতরাং হয় তাদের বাতিল নয় বদল করবার জন্য তাঁরা সদাই উৎসুক। খোদার উপর খোদকারী করবার প্রবৃত্তিটে কাজের লোকের পক্ষে যেমন অদম্য, সৌভাগ্যবশতঃ তেমনি নিষ্ফল। এই সব কারণে সাংসারিক লোকেরা, মানব-সমাজে সাহিত্যের জন্মও বন্ধ করতে পারে নি, তার

শ্রীবৃদ্ধিরও হানি কর্‌তে পারে নি; যদিচ সাহিত্যিকদের উপর অত্যাচার কর্‌তে, অন্ততঃ তাদের লাঞ্ছনাগঞ্জনা দিতে জনসাধারণ কখনও কসুর করে নি। যদি কোথায়ও দেখ যে, কোনও সাহিত্যিকের স্বসমাজে আদর হয়েছে—তখনই বুঝবে যে, সে ভদ্রলোক সাহিত্যের নামে বেনামি করে শুধু সাংসারিক কাজের কথা কয়েছেন।

(২)

আমি যে কাজের লোকের কথা বলছি, সে হচ্ছে কাজের কথার লোক। যারা যথার্থ কাজের লোক,--অর্থাৎ যারা লাঙ্গল চষে, ধান ভানে, চরকা কাটে, কাপড় বোনে, যারা হাত গুটিয়ে বসলে আমাদের দু'দিনেই বাক্‌রোধ হয়ে যায়,—তারা অবশ্য সাহিত্যের উপর কোনই অত্যাচার করে না; বরং সাহিত্যই তাদের উপর চিরদিনই অত্যাচার করে আস্‌ছে। যারা পড়্‌তে জানে না, লেখার উপর তাদের ভক্তি যেমন অযথা তেমনি অচলা। বারোমাস তারাই সরস্বতীর পূজা করে, যারা একদিনও দোয়াতকলম ছোঁয় না। যে কথা বইয়ে আছে, তাদের বিশ্বাস সে কথা মন্ত্র; এবং সে মন্ত্র যত বেশী দুর্বোধ তত বেশী তার মাহাত্ম্য। লোকশিক্ষার আসল দরকারটাই এই জন্যে যে, লেখাপড়া না শিখলে লোকের লেখাপড়ার ভয় ভাঙ্গে না। যে স্বল্পসংখ্যক লোক লেখাপড়ার সাহায্যে অসংখ্য নিরক্ষর লোকের মাথায় হাত বুলিয়ে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, এবং সেই দলিলে নিজেদের কাজের লোক মনে করেন,—সাহিত্য রচনা করা তাঁদের মতেই অকাজ। যারা নথি পড়ে কিম্বা পুঁথি পড়ায়, মন্ত্র

পড়ে ও মন্ত্র পড়ায়, খাতা লেখে কিম্বা পত্র লেখে,—তারাই সাহিত্যকে হয় অবজ্ঞা নয় উপেক্ষা করে। সামাজিক জীবনে এ সব লেখাপড়ার দরকার আছে, সুতরাং গুরুপুরোহিত, উকীল মোক্তার কেরাণী মাষ্টারের দল যে কাজের লোক, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই; এবং সে কাজের মূল্য যাই হোক, তার বাজার দর আছে। এঁদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোক শুধু নিজের ভাবনা ভাবেন, আর দু'চার জন অবসর মত পরের ভাবনাও ভাবেন। প্রথম দলের মতে সাহিত্যচর্চ্চাটা বাজে কাজ, দ্বিতীয় দলের মতেই অকাজ। এই পরোপকারীর দল হয় রাষ্ট্রীয় নয় সামাজিক ব্যবস্থার সংস্কার কর্‌তে সদাই ব্যস্ত, এবং তাও একমাত্র লেখাপড়া অর্থাৎ কথার সাহায্যে। তাই মানুষের সকল কথাকে তাঁরা তাঁদের কাজে লাগাতে চান্, এবং যে কথায় হালফিল সমাজের কি রাজ্যের বদল না হয়, তাঁদের বিশ্বাস সে কথার অপব্যয় হয়। যাঁর কথার ভিতর রূপ নেই কি শক্তি নেই, তিনি অবশ্য সাহিত্যিক নন্। অপরপক্ষে যাঁরা আগে নিজের উপকার করে, পরে পরের উপকার কর্‌তে ব্রতী হন, প্রায়শঃই দেখা যায় যে তাঁদের উপর লক্ষ্মীর যতটা কৃপা আছে, সরস্বতীর ততটা নেই। এঁরা সাহিত্যের উপর বিশেষ বিরক্ত, কেননা ভাল কথার এ ক্ষেত্রে বাজে খরচটা এঁদের কাছে একেবারেই অসহ্য। শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকারের কথাও যা, এঁদের কথাও তাই—শুধু যে ম্যালেরিয়া তাড়াবার প্রস্তাব এঁরা করেন, সে হচ্ছে এর ওর দেহের নয়—সমগ্র সমাজদেহের ম্যালেরিয়া। সে ম্যালেরিয়া যে এ দেশে আছে, আর যথেষ্ট পরিমাণে আছে, সে বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু এ স্থলেও সাহিত্যিকেরা দুঃখের সঙ্গে বল্‌তে বাধ্য যে, এ রোগের চিকিৎসা

করাও সাহিত্যের কাজ নয়। সরস্বতী যে ধন্বন্তরী—এ কথা শাস্ত্রেও লেখে না।

(৩)

এ কথা শুনে কাজের লোকেরা বল্‌বেন যে, তবে সাহিত্যের কি কাজ?—এক কথায় এর উত্তর দেওয়া শক্ত, কেননা সাহিত্যের কাজ প্রথমতঃ এক নয়—বহু; দ্বিতীয়তঃ একদিনের নয়—চিরদিনের। ভগবানের সৃষ্টির যেমন একটা কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য নেই, তেমনি মানুষের সৃষ্টিরও একটা কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য নেই। নানা লোকে নানা যুগে তার ভিতর নানা অর্থ দেখ্‌তে পায়—এতেই ত সৃষ্টির বিশেষত্ব। সাহিত্যের বিশিষ্টতাও ঐ গুণে। সৃষ্টির জানাশোনা সকল অর্থই আংশিক হিসেবে সত্য এবং সমগ্র হিসেবে মিথ্যা, কেননা তার পূরো অর্থটা একটা রহস্য—ইংরাজিতে যাকে বলে mystery। যে উক্তির অন্তরে তার সকল ব্যক্ত স্পষ্টতার ভিতরেও একটা অব্যক্ত রহস্য ফুটে না ওঠে—তা সাহিত্য নয়। এবং মানুষের পক্ষে এই চির-রহস্যের দর্শন লাভটা নিতান্ত প্রয়োজন, নচেৎ সে নিজের হাতের মাপে অনন্তের ইয়ত্তা কর্‌বে, নিজের সাংসারিক প্রয়োজনের হিসেব থেকে সৃষ্টির প্রয়োজন আবিষ্কার কর্‌বে—এক কথায়, তার ক্ষুদ্র অহংকে বিরাট আত্মার রাজাসনে বসাবে। সাহিত্যের প্রধান কাজ হচ্ছে মানুষের মনকে তার সাংসারিক প্রয়োজনের গণ্ডির বাইরে নিয়ে যাওয়া,—আত্মাকে অহংএর হাত থেকে মুক্তি দেওয়া। দেহের মত মনেরও একটা প্রয়োজন আছে, সেই প্রয়োজনসূত্রেই

সাহিত্য জন্মলাভ করেছে, এবং সেই প্রয়োজনের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হয়।

এর উত্তরে অসাহিত্যিকরা বল্‌বেন,—এ সব দর্শনের কথা, অর্থাৎ গাঁজাখুরি। দর্শনের কথা যে শুধু বাজে কথা নয়, উপরন্তু মিছে কথা—এ কথা আমিও মানি। তার কারণ, প্রতি দর্শনের উদ্দেশ্য হচ্ছে সমগ্র সৃষ্টির একটি স্পষ্ট অর্থ বার করা, এবং তার ভিতর যে রহস্য আছে তা' নেই—এই প্রমাণ করা। সুতরাং যে মনোভাব থেকে দর্শন জন্মলাভ করে, সাহিত্য জন্মায় তার ঠিক উল্টো মনোভাব থেকে। দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতি সবই বিশ্বের একদেশদর্শী, এবং সেই জন্য এ সব শাস্ত্রের ভিতর একটা একগুঁয়েমি আছে—যা কাজের বেলায় গোঁয়ারতুমিতে পরিণত নয়।—সমগ্র দৃষ্টি আছে শুধু সাহিত্যের; সুতরাং সাহিত্য, দর্শনও নয়, বিজ্ঞানও নয়, ধর্ম্ম-শাস্ত্রও নয়, নীতিশাস্ত্রও নয়—কিন্তু একাধারে ঐ সবই। মনোরাজ্যে এ প্রতিটিরই এক একটি ক্ষুদ্র নবাব হয়ে ওঠবার দিকে ঝোঁক আছে,—সাহিত্য এ দুষ্কার্য্যে বাধা দেয়, অর্থাৎ এ সবের ক্ষুদ্রত্ব প্রমাণ করে তাদের নবাবীর দাবী অপ্রমাণ করে। তা ছাড়া, এই সকল একগুঁয়ে গোঁয়ার শাস্ত্র, সব পরস্পর পরস্পরের বিরোধী, এবং এরা মনোজগতে যে কুরুক্ষেত্র বাধায়, সাহিত্য তার মধ্যস্থতা করে' সে জগতে শান্তি স্থাপন করে। তর্কের খাতিরে এ সব কথা মেনে নিলেও, পাঁচজনে বল্‌বেন,—সাহিত্য মানুষের মনের যে কাজেই লাগুক, মানুষের জীবনের কোনও কাজে ত লাগে না? দর্শন বিজ্ঞান, ধর্ম্ম নীতি, এ সবারই একটা ব্যবহারিক দিক্ আছে। মানব সমাজ যে অসভ্য অবস্থা থেকে ক্রমে সভ্য অবস্থায় এসে পৌঁচেছে, সে সবই ধর্ম্ম নীতি বিজ্ঞানাদির সাহায্যে। কিন্তু

সাহিত্য জীবনের কোন কাজে লেগেছে? মানুষকে চলাবার কিম্বা কল চালাবার কোন উপায় সাহিত্য উদ্ভাবন করেছে? জীবন-ছাড়া মন পরলোকে থাক্‌তে পারে, ইহলোকে নেই। সুতরাং সাহিত্য যদি জীবনের সহায় না হয়, তাহলে তার পরলোকগামী হওয়াই উচিত। সংক্ষেপে সাহিত্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, সাহিত্য ম্যালেরিয়া দূর কর্‌তে পারে না। এ কথা ঠিক, ও হচ্ছে ফলিত-বিজ্ঞানের কাজ, ফলিত-সাহিত্যের নয়;—কেননা ফলিত সাহিত্য বলে কোনও বস্তু নেই। এ অভিযোগের উত্তর হচ্ছে যে, যে-মনে পৃথিবী হতে ম্যালেরিয়া দূর কর্‌বার প্রবৃত্তি জন্মায়, সে মন গড়ে সাহিত্যে।

অতঃপর জিজ্ঞাস্য এই যে, দেশের দেহ থেকে ম্যালেরিয়ার বিষ নামানো কেন আমাদের পক্ষে অবশ্যকর্ত্তব্য? এ প্রশ্নের সর্ব্বজনীন উত্তর—এই কারণে যে, ও বিষ সাংঘাতিক, অর্থাৎ জীবনের পরিপন্থী; ম্যালেরিয়া হয় আমাদের মারে, নয় আমাদের সারে। অতএব ও-বস্তুকে দেশ-ছাড়া করা একটা মহৎ কাজ। মানুষের যত কাজ, সে সবেরই ত এক উদ্দেশ্য—মানুষকে বাঁচিয়ে রাখা। কিন্তু তারপর প্রশ্ন ওঠে, মানুষের বেঁচে থাক্‌বার প্রয়োজনটা কি?—এ প্রশ্নের উত্তর কাজ দিতে পারে না, কোন কর্ম্ম-শাস্ত্রও দিতে পারে না। এ ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও নীতি-শাস্ত্র নিরুত্তর থাক্‌তে বাধ্য; বাচাল হয়ে উঠবে শুধু দর্শন ও ধর্ম্মশাস্ত্র। বেশীরভাগ ধর্ম্ম দর্শন এ প্রশ্নের উত্তরে বলবেন,—বেঁচে থাক্‌বার কোনই প্রয়োজন নেই; জীবনটাই হচ্ছে জগতের প্রধান উৎপাত। সহজ মানুষে দর্শনের উপর যে এতটা হতশ্রদ্ধ, তার কারণ ও শাস্ত্র মানুষকে মার্‌তে না পারুক, আধমরা কর্‌তে পারে; ও হচ্ছে মনোরাজ্যের ম্যালেরিয়া-বিশেষ। অপরপক্ষে ধর্ম্মের প্রতি যে মানুষের ভক্তি

আছে, তার কারণ ধর্ম্ম মানুষকে ইহলোকের ও-পারে আর এক লোকের সন্ধান বলে দেয়, যেখানে ম্যালেরিয়া নেই। শুধু তাই নয়, ধর্ম্ম সে লোকে যাবার পথও আমাদের দেখিয়ে দেয়। তবে মানুষে যে ধর্ম্মকে ভক্তির চাইতে ভয় করে বেশী, তার কারণ,—ধর্ম্ম আর একটি লোকেরও খবর জানিয়ে দেয়, যেখানে ম্যালেরিয়া ছাড়া আর কিছু নেই—এবং সেই সঙ্গে বলে দেয় যে, মানুষের পক্ষে সেই দ্বিতীয় লোকে যাওয়াটাই সহজ, এবং সেই কারণে বিশেষ সম্ভব!

সাহিত্যই জীবনের একমাত্র সহায়, কেননা একমাত্র সাহিত্যই মানুষকে বেঁচে থাক্‌তে শেখায়; জীবনধারণের কোনও অবান্তর ফলের লোভ দেখিয়ে নয়, মানুষকে নিত্য নবজীবনে জীবিত করে। সাহিত্য জীবনের অর্থ জীবনের মধ্যেই খোঁজে, তার উপরে নীচে কিম্বা আশে পাশে নয়; এবং এই কারণেই তার চির-রহস্যের সাক্ষাৎ পায়,—বৈদান্তিক যেমন আত্মার সাক্ষাৎ আত্মার মধ্যেই লাভ করেন। জীবনের আসল অর্থ যে জীবনের মাত্রা বাড়ানো, এ সত্য সরস্বতী হাতেকলমে প্রমাণ করে দেন। সাহিত্য আমাদের কোন বিষয়ে শিক্ষিত করে না;—কেননা তার একমাত্র কাজ হচ্ছে, মানুষকে জীবনে দীক্ষিত করা। সরস্বতীর স্পর্শে, যা মৃত তা জীবিত হয়ে উঠছে, যা সুপ্ত তা জাগ্রত হচ্ছে, যা অব্যক্ত তা ব্যক্ত হচ্ছে। এ সত্য প্রমাণ করা যায় না; কেননা এ হচ্ছে প্রত্যক্ষ করবার বস্তু। মনোজগতেও অক্সিজেন আছে, যা না থাক্‌লে সে জগতে কিছুই বাঁচে না, কিছুই জ্বলে ওঠে না। যে কথার ভিতর সেই অক্সিজেন আছে, তারই নাম সাহিত্য—তা সে গানই হোক, গল্পই হোক, দর্শনই হোক, বিজ্ঞানই হোক, ধর্ম্মই হোক আর নীতিই হোক। এই কারণেই ইউরোপের প্রথম আর শেষ দার্শনিক

প্লেটো, এবং বার্গসনের দর্শন কাব্য ; এবং এই কারণেই সেক্সপিয়র ও কালিদাসের কাব্যও দর্শন।

অতএব দাঁড়াল এই যে, যখন দেখা যাবে সাহিত্যের বিরুদ্ধে সমাজের অভিযোগটা বেড়ে চলেছে, তখনই বুঝতে হবে নবসাহিত্য-সৃষ্টির যুগ এসেছে। জীবন পদার্থটা যখন আমরা যথেষ্ট পরিমাণে পাই নে—তখনই আমরা তার প্রতি যথেষ্ট পরিমাণে বিরক্ত হই। জীবনটা হচ্ছে মানুষের সব চাইতে বড় সখ, এবং এই সখের চর্চ্চা করাতেই সাহিত্যের সার্থকতা। এ অবস্থায় সাহিত্যকে ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে লড়বার অনুরোধ করার অর্থ, মশা মারতে এমন কামান পাতার উপদেশ দেওয়া, যার গ্যাসের স্পর্শে কিছুই মরে না, সবই বেঁচে ওঠে।

বীরবল।

লিখিবার ভাষা।

(বঙ্কিমচন্দ্রের মত)

বঙ্কিমচন্দ্র যে বহুবিধ প্রবন্ধ লিখেছেন, এ কথা আমার শোনা ছিল ; কিন্তু ইতিপূর্ব্বে তাঁর বিবিধ প্রবন্ধের একটি প্রবন্ধের সঙ্গেও আমার চাক্ষুষ পরিচয় ছিল না। এ নিতান্তই আপশোষের কথা ; কেননা আমি সম্প্রতি আবিষ্কার করেছি যে, যে-সব মতামত প্রচার করবার দরুণ সাহিত্য-সমাজের শুদ্ধাচারীরা আমাদের একঘরে করবার চেষ্টা করছেন, তার অনেক মতই বঙ্কিমচন্দ্রের মতের ঠিক অনুবাদ না হলেও, এক রকম নূতন সংস্করণ। এ কথা পূর্ব্বে জানা থাকলে, আমি বঙ্কিমচন্দ্রের আড়ালে দাঁড়িয়ে পূর্ব্বপক্ষের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হতুম, তাতে আর কিছু না হোক্, বিপক্ষদল আমার উপরে এলোমেলোভাবে বাণ বর্ষণ করতে সঙ্কুচিত হতেন। সে যাই হোক, বঙ্গসাহিত্যে আমরা যে পথ ধরে চলেছি, বঙ্কিমচন্দ্রই সে পথের প্রদর্শক। সে পথে যে আমরা তাঁর চাইতে একটু বেশী অগ্রসর হয়েছি, তার কারণ—সেটা যথার্থই একটা পথ, চোরাগলি নয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের বিবিধ প্রবন্ধ পড়্‌লে প্রথমেই চোখে পড়ে যে, এই পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালীর মনের বেশী বদল হয় নি। আমাদের সমাজ নিয়ে, সাহিত্য নিয়ে, অতীত নিয়ে, ভবিষ্যৎ নিয়ে যে তর্ক তাঁরা করতেন, আমরাও তাই করছি—এবং কতকটা একভাবেই করছি। একালের পূর্ব্বপক্ষ যে সেকালের পূর্ব্বপক্ষের উত্তরাধিকারী, তার

পরিচয় তাঁদের কথাতেই ধরা পড়ে, এবং উত্তরপক্ষের উত্তর সেকালে যা ছিল একালেও তাই আছে; সে জবাব এই যে, যা চলে আস্‌ছে তা চলবে কিনা, সে হচ্ছে বিচারসাপেক্ষ।

(২)

একটা চল্‌তি উদাহরণ নেওয়া যাক্। সকলেই জানেন যে, সাহিত্যের মাঠেঘাটে যে তর্কটা আজকাল জোরের সঙ্গে চল্‌ছে, সে হচ্চে ভাষা নিয়ে। এ তর্ক বহুকাল পূর্ব্বে তুলেছিলেন স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র; আমরা সেই তর্কটাই আবার নতুন করে তুলেছি। এ কথা আগে জান্‌লে, আমি তাঁর সূত্র অবলম্বন করে তার ভাষ্য রচনা কর্‌তুম, এবং তাতে কেউ আপত্তি কর্‌তেন না; যদিচ সকলেই জানেন যে, টীকাভাষ্যে মূল-সূত্রের মর্ম্ম বদলে যায়, ও তার ধর্ম্ম বেড়ে যায়। এ বদল হয় ভাষ্য-কারের দোষে নয়—কালের গুণে। আমরা সব বিষয়ে একটা authority চাই; ইতিপূর্ব্বে সেই authority দেখাতে না পারাতেই বিদ্বন্মণ্ডলী আমার কথা শুনে ডাইনে-বাঁয়ে মাথা নেড়েছেন, নচেৎ নাড়তেন উপরনীচে। আমি যে এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের মতেরই জের টেনে এনেছি, সেইটি দেখিয়ে দিতে পার্‌লে আশা করি আমাদের মাতৃভাষা সাহিত্যিকদের হাতে আর অত লাঞ্ছিত হবে না।

আমি আরম্ভেই বলেছি যে, আমি চল্‌তি ভাষার দিকে বঙ্কিমচন্দ্রের চাইতে একটু বেশী অগ্রসর হয়েছি, কিন্তু সে শুধু ক্রিয়াপদে—থিওরিতে তিনি চল্‌তি ভাষার দিকে আমাকে ঢের ছাড়িয়ে গিয়েছেন। তাঁর পরামর্শ অনুসারে চল্‌তে হলে, বিষবৃক্ষ নয়, আলালের ঘরের

দুলালকেই আমাদের গদ্যের আদর্শ কর্‌তে হয়। কেন?—তা ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

(৩)

আমার নামে অভিযোগ এই যে, আমি সাধুভাষার উপর আক্রমণ করেছি। এ অভিযোগ সম্পূর্ণ সত্য নয়। আমি বঙ্গসাহিত্যকে নিজের জোরে নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পরামর্শ দিয়েছি। সাধুভাষার উপর যদি কেউ তীব্র আক্রমণ করে থাকেন ত সে বঙ্কিমচন্দ্র; এবং সে আক্রমণের বেগটা যে কত তীব্র, তার পরিচয় নিম্নোদ্ধৃত বাক্যগুলি থেকেই পাবেন।

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন:—

"কিছুকাল পূর্ব্বে দুইটি পৃথক ভাষা বাঙ্গলায় প্রচলিত ছিল। একটির নাম সাধুভাষা, অপরটির নাম অপর ভাষা। একটি লিখিবার ভাষা, দ্বিতীয়টি কহিবার ভাষা।.....সাধুভাষায় অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দসকল বাঙ্গলা ক্রিয়াপদের আদিমরূপের সহিত সংযুক্ত হইত। যে শব্দ আভাঙ্গা সংস্কৃত নহে, সাধুভাষায় প্রবেশ করিবার অধিকার তাহার ছিল না।"

"তখন পুস্তক-প্রণয়ন সংস্কৃত-ব্যবসায়ীদের হাতে ছিল। অন্যের বোধ ছিল যে, যে সংস্কৃত না জানে, বাঙ্গলা গ্রন্থ-প্রণয়নে তাহার কোন অধিকার নাই, সে বাঙ্গলা লিখিতে পারেই না।.....সুতরাং বাঙ্গালায় রচনা ফোঁটাকাটা অনুস্বরবাদীদিগের একচেটিয়া মহল ছিল.....তাঁহারা ভাবিতেন, সংস্কৃতেই তবে বুঝি বাঙ্গলা ভাষার গৌরব; যেমন গ্রাম্য বাঙ্গালী স্ত্রীলোক মনে করে যে, শোভা বাড়ুক আর না বাড়ুক, ওজনে ভারি সোণা পরিলেই অলঙ্কার পরার গৌরব হইল, এই গ্রন্থকর্ত্তারা তেমনি জানিতেন, ভাষা সুন্দর হউক বা না হউক, দুর্ব্বোধ্য সংস্কৃতবাহুল্য থাকিলেই রচনার গৌরব হইল"—

এর পর, বঙ্কিমচন্দ্র যে কোন্ ভাষার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছিলেন, সে কথা বোধহয় আর কাউকে বুঝিয়ে বলবার দরকার নেই, কেননা তিনি এ স্থলে যথেষ্ট স্পষ্ট কথা বল্‌তে কসুর করেন নি। বাঙ্গলা-গদ্যের আদি লেখকদের কোনরূপ খাতির রাখাও তিনি আবশ্যক বোধ করেন নি। তার কারণ তিনি চেয়েছিলেন ঐ সাধুভাষাকে মূলে হাবাৎ করতে। এবং সেই জন্যই তিনি ৺প্যারীচাঁদ মিত্রের জয়গান করে' তাঁর প্রবন্ধ সুরু করেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের কথা এই ঃ—

"টেকচাঁদ ঠাকুর প্রথমে এই বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করিলেন।..... ... যে ভাষায় সকলে কথোপকথন করে, তিনি সেই ভাষায় "আলালের ঘরের দুলাল" প্রণয়ন করিলেন। সেই দিন হইতে শুষ্ক তরুর মূলে জীবনবারি নিষিক্ত হইল।"

আমিও সাধুভাষার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করি, কিন্তু অত কড়া কথায় ও চড়া গলায় নয়; তার কারণ, ইংরেজি শিক্ষার আদিম ঝাঁঝটা আমাদের যুগে অনেকটা মরে এসেছে। তা ছাড়া আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, যে বিষবৃক্ষের মূলে টেকচাঁদ ঠাকুর কুঠারাঘাত করেছিলেন, সেই বৃক্ষের কলমের চারায় আমাদের সাহিত্যজগৎ ছেয়ে গিয়েছে, এবং তারই ফলের অন্তরে পাঠক-সমাজ কাব্যামৃতের রসাস্বাদ লাভ করেন।

(৪)

বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র প্রবন্ধটি পাঠ করে অনেকে বল্‌তে পারেন যে, এ ক্ষেত্রে তিনি ওকালতি করেন নি, জজিয়তি করেছেন। এবং এ মামলার তিনি যে রায় দিয়েছেন, তাকেই চূড়ান্ত হিসাবে গণ্য করতে হবে—কেননা সে হচ্ছে সাধুভাষার বিরুদ্ধে বিলেত-আপিলের রায়।

এমন কথা যে অনেকে বল্‌তে পারেন, শুধু তাই নয়—আমার বিশ্বাস কেউ কেউ ইতিমধ্যে তা বলেওছেন। কিন্তু কথাটা সত্য নয়। তিনি এ ক্ষেত্রে প্রথমে উকীল হয়ে সওয়াল জবাব করেছেন, পরে জজ হয়ে রায় প্রকাশ করেছেন। তিনি সাধুভাষার বিপক্ষে পূরোদমে লড়েছেন, কিন্তু "অপর ভাষার" পুরোদাবীর ডিক্রী দেন নি। তার কারণ, যেখানে রেষারেষী সূত্রে উভয়পক্ষের দাবীই অসম্ভবরকম বেড়ে যায়, সেখানে বুদ্ধিমান উকীলের পক্ষে সে দাবীর কিছু বাদসাদ দিয়ে বাহাজ করাটাই স্বাভাবিক। প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র এস্থলে বিচারকের আসন গ্রহণ করেন নি—তিনি "অপর ভাষার" কোটই বজায় রেখেছেন, শুধু তার অতিরিক্ত দাবীটে ছেড়ে দিয়ে। সাধুভাষীদের কোনরূপ প্রশ্রয় দেওয়া দূরে থাক্, তাঁদের কথা তিনি আমলেই আনেন নি। রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় "আলালের ঘরের দুলালের" বিরুদ্ধে এই আপত্তি জানিয়েছিলেন যে, ও পুস্তক পিতাপুত্রে একত্র বসে পাঠ করা যায় না ; এ কথার উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র বলেন ঃ—

"তাহার প্রকৃত কারণ টেকচাঁদে রঙ্গরস আছে। বাঙ্গালাদেশে পিতাপুত্রে একত্র বসিয়া রঙ্গরস পড়িতে পারে না। সরলচিত্ত অধ্যাপক অতটুক্ বুঝিতে না পারিয়াই বিদ্যাসাগরী ভাষার মহিমাকীর্ত্তণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ভাষা হইতে রঙ্গরস উঠাইয়া দেওয়া যদি ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের মত হয়, তবে তাঁহারা সেই বিষয়ে যত্নবান হউন। কিন্তু তাহা বলিয়া অপ্রচলিত ভাষাকে সাহিত্যের ভাষা করিতে চেষ্টা করিবেন না"—

বঙ্কিমচন্দ্রের উক্ত ভাষাই প্রমাণ, তিনি সেকালের সাধুভাষীদের কোনরূপ তোয়াক্কা রাখ্‌তেন না। "অপ্রচলিত ভাষাকে সাহিত্যের ভাষা করিতে চেষ্টা" করতে আমরাও বারণ করি, কিন্তু তাই বলে

সাধুভাষাকে, "বিদ্যাসাগরী" এই অবজ্ঞাসূচক বিশেষণে বিশিষ্ট করতে আমরা সঙ্কুচিত হই। বিদ্যাসাগর মহাশয়ই যে সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গলা গদ্যের গড়ন দেন, এ সত্য আমি প্রবন্ধান্তরে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছি। তা ছাড়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের লেখার একটি মহাগুণ ছিল। বাঙ্গলা তাঁদের হাতে অপ্রাকৃত হলেও, সংস্কৃত তাঁদের হাতে বিকৃত হয় নি। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধটি পড়ে মনে হয়, সেটি একটু রাগের মাথায় লেখা; এবং বোধহয় তার কারণ এই যে, ন্যায়রত্ন মহাশয় "মৃণালিনীকে" শুধু "আলালের ঘরের দুলাল" নয়, "হুতুমপেঁচার" সঙ্গেও এক পর্য্যায় ভুক্ত করেছিলেন। প্রত্যুত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র বলেন "টেকচাঁদী ভাষার সঙ্গে এবং তাঁহার (ন্যায়রত্ন মহাশয়ের) ভাষার সঙ্গে কোন প্রভেদ নাই"। এ অবশ্য ভাষায় যাকে বলে উল্টোচাপ;—পাল্টা জবাব হিসেবে এ কথা অসঙ্গত নয়। আজকের দিনে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই যে, মৃণালিনীর ভাষার সঙ্গে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ভাষার বিশেষ প্রভেদ নেই; কিন্তু এ দুয়েরই টেকচাঁদী ভাষার সঙ্গে যথেষ্ট প্রভেদ আছে।—বঙ্কিমচন্দ্র টেকচাঁদ ঠাকুরের যতই গুণগান করুন না কেন, তাঁর কলমের মুখ থেকে যা বেরিয়েছে, তা আলালী ভাষা নয়—যদি কিছু হয়ত দুলালী ভাষা। তর্কান্ধ হলে সাধুভাষীরা যে প্রতিপক্ষের ভাষার স্বরূপটি দেখতে পান না, তার প্রমাণ এ যুগেও দুর্ল্লভ নয়। নিত্য দেখতে পাই, সাধুবাদীরা বীরবলী ভাষাকেও হুতোমী ভাষার সঙ্গে এক পংক্তিতে বসিয়ে দেন।

(৫)

বঙ্কিমীযুগে এ মামলার বাদী ও প্রতিবাদীরা বেশ স্পষ্ট দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন।—শিক্ষায় দীক্ষায় এ দুই দলের পরস্পরের

সঙ্গে পরস্পরের কোনও মিল ছিল না। সেকালে এই ভাষার ঝগড়াটা ছিল টোলের সঙ্গে কলেজের ঝগড়া। এর পরিচয় বঙ্কিমচন্দ্রের মুখেই পাওয়া যায়। তাঁর কথা এই ঃ—

"এক্ষণে বাঙ্গলাভাষার সমালোচকেরা দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছেন। একদল খাঁটি সংস্কৃতবাদী—যে গ্রন্থে সংস্কৃতমূলক শব্দ ব্যবহার হয়, তাহা তাঁহাদের বিবেচনায় ঘৃণার যোগ্য"।—

এস্থলে বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য "সংস্কৃত ভাঙ্গা" অর্থেই "সংস্কৃতমূলক" শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

প্রতিবাদী দলের পরিচয়ও তাঁর কাছথেকেই পাওয়া যায়। তিনি বলেন ঃ—

"অপর সম্প্রদায় বলেন, তোমাদের ও কচকচি বাঙ্গালা নহে, উহা আমরা কেন গ্রন্থে ব্যবহার করিতে দিব। যে ভাষা বাঙ্গালা সমাজে প্রচলিত, যাহাতে বাঙ্গালার নিত্যকার্য্যসকল সম্পাদিত হয়, যাহা সকল বাঙ্গালীতে বুঝে, তাহাই বাঙ্গালা ভাষা, তাহাই গ্রন্থাদির ব্যবহারের যোগ্য। অধিকাংশ সুশিক্ষিত ব্যক্তি এক্ষণে এই সম্প্রদায়ভুক্ত।"

বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য সুশিক্ষিত বলতে বুঝতেন ইংরাজিশিক্ষিত। এবং বঙ্কিমচন্দ্রের মতে ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবেই বাঙ্গালী বাঙ্গলা ভাষার ভক্ত হন, এবং এ শিক্ষায় বঞ্চিত হলেই লোকে "অনুস্বরবাদী" হয়।

টেকচাঁদ ঠাকুর সম্বন্ধে তিনি বলেন ঃ—

"তিনি ইংরাজিতে সুশিক্ষিত, ইংরাজিতে প্রচলিত ভাষার মহিমা দেখিয়াছিলেন, এবং বুঝিয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন, বাঙ্গালার প্রচলিত ভাষাতেই

বা কেন গদ্যগ্রন্থ রচিত হইবে না? যে ভাষায় সকলে কথোপকথন করে, সেই ভাষায় আলালের ঘরের দুলাল প্রণয়ন করিলেন"—

বিপক্ষদলের সম্বন্ধে তিনি বলেন ঃ—

"সংস্কৃতবাদী সম্প্রদায়ের মুখপাত্রস্বরূপ আমরা রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়কে গ্রহণ করিতেছি".....ন্যায়রত্ন মহাশয় সংস্কৃতে সুশিক্ষিত, কিন্তু ইংরাজি জানেন না—পাশ্চাত্য সাহিত্য তাঁহার নিকট পরিচিত নহে।.....পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুশীলনে যে সুফল জন্মে, ন্যায়রত্ন মহাশয় তাহাতে বঞ্চিত"—

এই পক্ষাপক্ষ সুনির্দ্দিষ্ট থাকার দরুণ, সে যুগের ভাষার মামলার ইযু ছিল সবে একটি, এবং সেটিও ছিল অতি স্পষ্ট। এ তর্কটা যে আজকাল গোলযোগে পরিণত হয়েছে তার কারণ, এ কালের সাধুবাদীরা "সংস্কৃতে সুশিক্ষিত নন, কিন্তু" "ইংরাজি জানেন"। তার পর "পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুশীলনে যে সুফল জন্মে"—এমন কথা মুখে আনবার সাহস অনেকের নেই। কেননা ও কথা বল্‌তে গেলে রাশ রাশ ইংরেজী কোটেসনের মার সহ্য করবার জন্য বক্তাকে প্রস্তুত হতে হয়; সেই ভয়েই ত আমরা ছন্দ নিরুক্ত কল্প ব্যাকরণ ইতিহাস পুরাণের দোহাই দিই। বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে বাঙ্গালী, সাহিত্যে বুদ্ধির পরিচয় দিত, এ যুগে আমরা পরিচয় দিই বিদ্যের। বাঙ্গলা সাহিত্য যে বাঙ্গলা ভাষাতেই লেখা উচিত, এই সোজা কথাটাকে শক্ত করে তোলবার জন্য, আমরা অপরাবিদ্যার ভাণ্ডার খালি করেছি—এর পরে পরাবিদ্যার সাহায্য ব্যতীত সম্ভবতঃ এ তর্কের আর শেষ মীমাংসা হবে না। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় বলতে গেলে, বঙ্কিমচন্দ্র—বিদ্যার ও "কচকচি" ত্যাগ করে, সহজ বুদ্ধির উপর নির্ভর করেই এ মামলার বিচার করেছিলেন।

(৬)

আমি পূর্ব্বে বলেছি সেকালে এ মামলার ইযুটা ছিল অতি স্পষ্ট। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন যে, পণ্ডিতি মতে ঃ—

"যে শব্দ আভাঙ্গা সংস্কৃত নহে, সাধুভাষায় প্রবেশ করিবার তাহার কোনও অধিকার ছিল না।"—এবং কলেজি মতে ঃ—

"রূপান্তরিত প্রচলিত সংস্কৃতমূলক শব্দের পরিবর্ত্তে কোন স্থলেই অরূপান্তরিত সংস্কৃত ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে"—

অর্থাৎ পণ্ডিতেরা চেয়েছিলেন তদ্ভব ও দেশী শব্দকে বয়কট কর্‌তে, আর ইংরেজি-শিক্ষিতেরা চেয়েছিলেন তৎসম শব্দকে বয়কট কর্‌তে।

সেকালে তদ্ভব শব্দের বিরুদ্ধে ভট্টপল্লীতে যে ধর্ম্মঘট করা হয়েছিল, এ অবশ্য ঐতিহাসিক সত্য নয়। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের প্রবন্ধ থেকে বঙ্কিমচন্দ্র যে অংশ উদ্ধৃত করে দিয়েছেন, তারই এক জায়গায় আছে ঃ—

"ঐরূপ (আলালী) ভাষায় গ্রন্থ রচনা করা উচিত কিনা? আমাদের বোধে অবশ্য উচিত। যেমন ফলারে বসিয়া অনবরত মিঠাই মণ্ডা খাইলে জিহ্বা একরূপ বিকৃত হইয়া যায়, মধ্যে মধ্যে আদার কুচি ও কুমড়ার খাট্টা না দিলে ইত্যাদি"—

বলা বাহুল্য এ লেখায় তদ্ভব ও দেশী শব্দই প্রায় সমস্ত জায়গা জুড়ে বসে আছে। শুধু তাই নয়, আমার বিশ্বাস একালের সাধুসাহিত্যে "ফলার" চলে না, এ যুগে সাহিত্যিকরা পাঠকদের ফলাহার করান। এমন কি আমার কাণেও খাট্টা শব্দটি খোট্টাই লাগে। সুতরাং "ফোঁটাকাটার" দল যে বেজায় সানুনাসিক ছিলেন, এ অপবাদ সত্য নয়। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মতে "হুতোমী" ভাষারও সাহিত্যে স্থান

আছে, অপরপক্ষে বঙ্কিমের মতেই সে ভাষা তিরস্কৃত। লোকের রুচি ভিন্ন, এবং সেকালের পণ্ডিত মহাশয়দের চাট্‌নিতে অরুচি ছিল না। তাঁরা যে রঙ্গরসের বিরোধী হওয়া দূরে থাকুক, অতিরিক্ত পক্ষপাতী ছিলেন—তার প্রমাণ ও রসের আতিশয্য বশতঃ বাংলার আদি গদ্য-লেখক মৃত্যুঞ্জয় তর্কলঙ্কার মহাশয়ের গ্রন্থ দুই বন্ধুতে একত্র বসে পাঠ করা যায় না।

(৭)

আসলে বাড়াবাড়িটে করেছিলেন ইংরেজি শিক্ষিত দলের সেই মুখপাত্রেরা—যাঁরা বঙ্গসাহিত্যের রাজ্য থেকে তৎসম শব্দকে বহিষ্কৃত করবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। এই টোল আর কলেজের ঝগড়াটা বঙ্গসাহিত্যে বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের ঝগড়া। ইংরেজি শিক্ষার বলে যাঁরা বাঙ্গলার নব-ব্রাহ্মণ হয়ে উঠেছিলেন, ক্ষত্রিয়ের তেজ তাঁদের শরীরেই ছিল। তাঁরা যদি তাঁদের মতানুসারে নব-বঙ্গসাহিত্য গড়ে তুলতেন—তাহলে সে সাহিত্য যে বিশ্বামিত্রের সৃষ্টি হত, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় নবীন বয়েসের নবীন উৎসাহে একখানি কাব্য রচনা করেন, যার ভিতর যুক্তাক্ষরের নামগন্ধও ছিল না; সে কাব্যের নাম "গোচারণের মাঠ"। যদি গদ্যলেখকেরাও তাঁর দেখাদেখি সাহিত্য রচনা করতেন, তাহলে বঙ্গসাহিত্যের ক্ষেত্র যে গোচারণের মাঠ হয়ে উঠত, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

বঙ্কিমচন্দ্র যে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মত, ষোল-আনা না হোক চৌদ্দ আনা অনুমোদন করতেন, সে কথা তিনি নিজ জবানি কবুল করে

গেছেন। "সংস্কৃতের সহিত সম্বন্ধশূন্য" অর্থাৎ দেশী ও বিদেশী শব্দ সম্বন্ধে তিনি বলেন যে ঃ—

"এই শ্রেণীর শব্দসকল তাঁহারা (সাধুভাষীর দল) রচনা হইতে একেবারে বাহির করিয়া দেন। অন্যের রচনায় সে সকল শব্দের ব্যবহার শেলের ন্যায় তাঁহাদিগকে বিদ্ধ করে। ইহার পর মূর্খতা আমরা দেখি না।.....এই পণ্ডিতেরা সেই মত মূর্খ।"

কার মত?—সেই ঘোরতর মূর্খ ইংরাজের মত, যিনি আস্‌রফি ফেলে গিনি রাখেন। উপমাটি অবশ্য উল্টো হয়েছে, কেননা গিনিই বাজারে চলে, আর আস্‌রফি অপ্রচলিত;—তবুও বঙ্কিমচন্দ্রের মনোভাব স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

একালে অবশ্য আমরা, চলতি বাঙ্গলার পক্ষপাতীরা, সাধুভাষীদের প্রতি ওরূপ ভাষা ব্যবহার করি নে। আমরা হলে বলতুম এই পণ্ডিতেরা সেইমত পণ্ডিত।

সে যাই হোক্, বঙ্কিমচন্দ্র যে এই দেশী বিদেশী শব্দের কতদূর পক্ষপাতী ছিলেন, তার পরিচয় নিম্নোদ্ধৃত কথাগুলিতে পাওয়া যায় ঃ—

"বলিবার কথাগুলি পরিস্ফুট করিয়া বলিতে হইবে—যতটুকু বলিবার আছে সবটুকু বলিবে—তজ্জন্য ইংরেজি, ফার্সি, আরবী, সংস্কৃত, গ্রাম্য, বন্য যে ভাষার শব্দের প্রয়োজন তাহা গ্রহণ করিবে"—

আমাদের মত অবশ্য এত উদার নয়—কেননা অপর ভাষা হতে যদৃচ্ছাক্রমে শব্দ চয়ন করলে রচনা খিচুড়ি হয়ে যাবার সম্ভাবনা। এ স্বাধীনতা সকলকে দেওয়া যায় না, কেননা কার কতটুকু "বলিবার" আছে, তার খবর শুধু তাঁর অন্তর্য্যামীই জানেন। আমরা এই

পর্য্যন্ত বলি যে, যে-বিদেশী শব্দ বাঙ্গলা হয়ে গিয়েছে—তা বাঙ্গলা কথা হিসেবেই ব্যবহার্য্য। সে যাই হোক্, যখন দেখতে পাচ্ছি যে, এক আরণ্যক-ভাষার উপদ্রবেই বঙ্গসাহিত্য অস্থির—তখন এ ক্ষেত্রে বন্য-ভাষার আবাদ কর্‌তে সাহিত্যিকদের পরামর্শ দেবার মত সাহস আমাদের নেই।

(৮)

আসলে কিন্তু দেশী শব্দকে সাহিত্যের জাতে তোলবার জন্য ওকালতির বিশেষ কোনও আবশ্যক ছিল না। কেননা দেশী শব্দ বাঙ্গলা-ভাষায় খুঁজে পাওয়াই ভার। যে সব শব্দ কাণে শুন্‌তে মনে হয় "সংস্কৃতের সঙ্গে সম্বন্ধশূন্য", তাদের কুলের খবর নিতে গেলে প্রায়ই দেখা যায় যে, তারা আর্য্যবংশোদ্ভব,—এক কথায় তদ্ভব। বাঙ্গালীর বুকে দ্রবিড়মঙ্গলের রক্ত থাকতে পারে, কিন্তু বাঙ্গালীর মুখে মোগলতামলের ভাষা নেই। যে সব শব্দের মূল সংস্কৃত কিম্বা প্রাকৃতের জমি খুঁড়ে পাওয়া যায় না, তারা ভুঁইফোঁড় কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। আমার মতে সেগুলিকে দেশী না বলে, বিদেশীর দলে ফেলে দেওয়াই নিরাপদ।

সে যুগে আসল ঝগড়াটা ছিল তৎসমের সঙ্গে তদ্ভবের। শিক্ষিত সম্প্রদায় সাহিত্য হতে তৎসম শব্দের উচ্ছেদের জন্য যে আড়েহাতে লেগেছিলেন, তার পরিচয় আলালী ও হুতোমা ভাষায় পাওয়া যায়। এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য এই ঃ—

"যদিও আমরা বলি না যে, "ঘর" প্রচলিত আছে বলিয়া গৃহশব্দের ব্যবহার উচ্ছেদ করিতে হইবে, মাথা শব্দ প্রচলিত আছে বলিয়া মস্তক শব্দের

উচ্ছেদ করিতে হইবে, কিন্তু আমরা এমত বলি যে, অকারণে ঘর শব্দের পরিবর্ত্তে গৃহ, অকারণে মাথার পরিবর্ত্তে মস্তক, অকারণে পাতার পরিবর্ত্তে পত্র এবং তামার পরিবর্ত্তে তাম্র ব্যবহার উচিত নহে। কেননা, ঘর, মাথা, পাতা, তামা বাঙ্গলা; আর গৃহ, মস্তক, পত্র, তাম্র সংস্কৃত। বাঙ্গলা লিখিতে গিয়া অকারণে বাঙ্গালা ছাড়িয়া সংস্কৃত কেন লিখিব? আর দেখা যায় যে, সংস্কৃত ছাড়িয়া বাঙ্গলা শব্দ ব্যবহার করিলে রচনা অধিকতর মধুর সুস্পষ্ট ও তেজস্বী হয়"—।

এর পর সাধুভাষার পক্ষে আর কোন কথা বলা চলে না। বঙ্কিম-চন্দ্র অবশ্য অকারণেই সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারের বিপক্ষে ছিলেন। সুতরাং তাঁর মতে কি কারণে তৎসম শব্দ ব্যবহার্য্য—তারও সন্ধান নেওয়া আবশ্যক।

(৯)

সংস্কৃতের বিরুদ্ধে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের রায়ে বঙ্কিমচন্দ্র যে সায় দিয়েছিলেম, তার একমাত্র কারণ—তাঁর মতে সকল সংস্কৃত শব্দ সাধারণের বোধগম্য নয়। তিনি বলেছেন ঃ—

"এমন কতকগুলি শব্দ আছে যে, তাহার আদিমরূপ সাধারণের বোধগম্য নহে—তাহার অপভ্রংশই সকলের বোধগম্য। এমত স্থলেই আদিমরূপ কদাচ ব্যবহার্য্য নহে"—

এ কথা এত জোর করে বল্‌বার কারণ, তাঁর মতে গ্রন্থের প্রয়োজন ঃ—

"যে পড়িবে তাহার বুঝিবার জন্য। যদি কোন লেখকের উদ্দেশ্য থাকে যে, আমার গ্রন্থ দুই চারিজন শব্দপণ্ডিতে বুঝুক, আর কাহারও বুঝিবার প্রয়োজন নাই।.....আমরা তাঁহাকে পরোপকারকাতর খলস্বভাব পাষণ্ড বলিব।..... যদি সে সর্ব্বজনের প্রাপ্য ধনকে, তুমি এমন দুরূহ ভাষায় নিবদ্ধ রাখ যে, কেবল

যে কয়জন পরিশ্রম করিয়া সেই ভাষা শিখিয়াছে তাহারা ভিন্ন অপর কেহ তাহা পাইতে পারিবে না, তবে তুমি অধিকাংশ মনুষ্যকে তাহাদিগের স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিলে। তুমি সেখানে বঞ্চক মাত্র।"..... ..

বাঙ্গলা ছেড়ে সংস্কৃত ব্যবহার কর্‌লেও, রচনা মধুর না হোক, তা যে যথেষ্ট সুস্পষ্ট ও তেজস্বী হতে পারে—উপরোক্ত বাক্যগুলিই তার প্রমাণ। এস্থলে সাধুভাষীদের প্রতি 'পাষণ্ড' 'বঞ্চক' প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ বোধ হয় "তোর শীল তোর নোড়া, ভাঙ্গি তোর দাঁতের গোড়া" এই বচন অনুসারেই করা হয়েছে।

(১০)

আমরা অবশ্য তৎসম শব্দের বিদ্বেষী নই; কেননা বঙ্গ-সরস্বতীর ভাণ্ডারে ও-জাতীয় বহুশব্দ আছে। তাদের সাহিত্য থেকে উচ্ছেদ করবার কোনই কারণ নেই, এবং তাদের স্বত্ব রক্ষা কর্‌বার জন্য কোন ওকালতিরও দরকার নেই। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও এমন কতকগুলি সংস্কৃত শব্দের উল্লেখ করেছেন, যার অর্থ তাঁর বিশ্বাস ছিল বাঙ্গালী মাত্রেই জানে।—কিন্তু একটা জিনিস তাঁর চোখ এড়িয়ে গেছে; সে হচ্ছে এই যে, তৎসম ও তদ্ভব শব্দের ভিতর যে শুধু রূপের প্রভেদ আছে তা নয়, অল্পবিস্তর অর্থেরও প্রভেদ আছে। অনেকে বল্‌তে পারেন যে, সে প্রভেদ অনেকস্থলেই অতি সূক্ষ্ম। কিন্তু অর্থের এই সকল সূক্ষ্ম প্রভেদগুলির প্রতি অমনোযোগী হয়ে লিখতে বসলে সে লেখা সাহিত্য হয় না। উদাহরণস্বরূপ 'ঘর' ও 'গৃহ' শব্দ দুটি নেওয়া যাক্।—সকলেই জানেন যে "ঘরের কথাকে" "গৃহের বাক্য" বল্‌লে রচনার মস্তক ভক্ষণ করা না হো'ক, মাথা খাওয়া হয়। তারপর

গৃহস্থ ও "গেরস্থ", এ দুই একই ব্যক্তি নয়; আর গিন্নী ও গৃহিণীর ভিতর প্রায় সেই প্রভেদ আছে, যে প্রভেদ বাম্‌নী ও ব্রাহ্মণীর ভিতর আছে। তা ছাড়া বাঙ্গলা ভাষায় দু'কথার সমাস চলে; এবং সেই সূত্রে যেখানে তৎসম কথা চলে, সেখানে তদ্ভব কথা অচল। কেউ যদি "চন্দ্রগ্রহণ"-এর পরিবর্ত্তে বঙ্গসাহিত্যে "চাঁদ নেওয়া"র পক্ষপাতী হন্, তাহলে তাঁর ভাগ্যে জুটবে শুধু অর্দ্ধচন্দ্র। যিনি বামুন ভোজন করান, তাঁর বাড়াতে নিশ্চয়ই কোনও ব্রাহ্মণ ভোজন করে না। তৎসম ও তদ্ভব শব্দের যে ইচ্ছামত অদলবদল করা যায় না, তা শত শত উদাহরণের সাহায্যে প্রমাণ করা যায়;—সুতরাং আমাদের ও দুই চাই।

শুধু মানের হিসাবে নয়, কাণের হিসাবেও বঙ্গসাহিত্যে তৎসম কথার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। গদ্যেরও একটা ছন্দ আছে, সেই ছন্দ রক্ষা কর্‌তে কোথায়ও বা 'নূতন' কোথাও বা 'নতুন' শব্দ ব্যবহার কর্‌তে হয়।

তবে তদ্ভবের সঙ্গে কতখানি তৎসমের খাদ মেশাতে হবে—তার সন্ধান বলে দেবে লেখকের সুরুচি। ভাষা সম্বন্ধে যাঁর রুচি সু নয়, তিনি হাজার পণ্ডিত হলেও তাঁর লেখা সাহিত্য হবে না।—যাঁর হাতে তদ্ভব ও তৎসম শব্দের মিলন "সুবর্ণে সৌভাগ্য" হয়, সাহিত্য-জগতে তাঁর ভাগ্য যে প্রসন্ন নয়, এ কথা জোর করে বলা যেতে পারে সুতরাং নিষ্প্রয়োজনে তৎসম শব্দের ব্যবহার যে দোষের, বঙ্কিম-চন্দ্রের এ মত মেনে নিতে আমাদের কোনই আপত্তি নেই, যদি আমরা সাহিত্যের সকলরকম প্রয়োজনের কথা স্মরণ রাখি। আর এক কথা, নিষ্প্রয়োজনে তদ্ভব শব্দের ব্যবহারও সমান দোষের।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই কঠিন আঘাতেও সাধুভাষা যে সাহিত্যলীলা সম্বরণ

করেন নি, তার কারণ, তাঁর তর্কের এক জায়গায় ফাঁক ছিল। তিনি বলেছেন যে, ভাষাকে সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট কর্‌বার জন্য সংস্কৃত শব্দের আবশ্যক। এ হচ্ছে সদর ফটক বন্ধ করে খিড়কির দরজা খুলে রাখা। বাক্যের গড়নই যে তার প্রধান সৌন্দর্য্য, এ জ্ঞান সকলের নেই।—"শোভা বাড়ুক আর না বাড়ুক, ওজনে ভারি সোণা পরলেই অলঙ্কার পরার গৌরব হইল"—এরূপ যাদের ধারণা, সে বংশ আজও আছে। ঐ ভারি সোণার লোভে ঐ খোলা খিড়কির দুয়োর দিয়ে অলঙ্কার লোভীরা রাতারাতি সংস্কৃতের ঘরে ঢুকে অন্ধকারে যা হাতে পড়েছে, তাই নিয়ে এসে সরস্বতীর ভাণ্ডার পূর্ণ করেছেন, ফলে অলঙ্কার পরার গৌরবে সাধুভাষা বঞ্চিত হয় নি। তবে তাতে করে বঙ্গসাহিত্যের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়েছে কিনা, সে কথা বঙ্কিমচন্দ্র বর্ত্তমান থাকলে বল্‌তে পার্‌তেন।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

বর্ত্তমান সাহিত্য।

দেদার ভিস্তি নাকি গোয়ালা সেজে বাঙ্গলা সাহিত্যের হাটে খাঁটী দুধ বলে হুবহু ঘোলাজল চালিয়ে দিচ্ছে,—এমনধারা গুজব বাজারে খুব জোর রটেছে! কতিপয় সাধু সাহিত্যিক ইতিমধ্যেই অনেক শ্রমসাধ্য গবেষণার পরে, জল আর দুধের যে তত্ত্বগত তফাৎ, সেটা নিঃশেষে ও নিঃসন্দেহে আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছেন। আর তাঁদের এই উপপত্তির প্রথম অনুমান হিসেবে কিছুদিন থেকে তাঁরা এমন কথাও খুব জোর গলায় যখনতখন বলে' আসছেন যে, সাহিত্যের পসরায় অজানা-অচেনা যা'-কিছু দেখা যাবে—সবই হবে অখাদ্য; অথবা সাহিত্যের আসরে বাঁধিগৎ ছাড়া যা'-কিছু বাজ্‌বে—সবই হবে বেসুরো!

তাঁদের মতে সাহিত্য-ক্ষেত্রে পুরাতনের 'পরে নূতন আলোক-পাতের চেষ্টা—অনধিকারচর্চ্চা; আর নূতনকে পুরাতনের অন্তর্ভুক্ত কর্‌বার প্রয়াস—সন্দেহজনক! এই সব সন্দেহ আর অনধিকার-চর্চ্চার হাত থেকে আমাদের সাহিত্যকে বাঁচাতে গিয়ে, সাহিত্যিকদের ভিতরে যেরকম মারামারির সূত্রপাত হয়েছে, তাতে করে' সাহিত্য-ক্ষেত্র ক্রমশঃ কুরুক্ষেত্রে পরিণত হতে চলেছে! আর ইতিমধ্যেই এর ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে ছোট বড় মাঝারি নানান্ রকমের চক্রব্যূহের পত্তন সুরু হয়েছে।—দেখে শুনে মনে হয় আমাদের সাহিত্যে একটা যুগান্ত বা যুগ-সন্ধি-কাল এসে পড়েছে!

পার্ব্বত্য-প্রদেশ ছেড়ে, নদী যখন সমতলের বুকে গড়িয়ে পড়ে, তখন তার উচ্ছসিত কলহাসি পরিণত হয় মৃদুগুঞ্জনে, আর উদ্দাম অগ্রগতি পরিবর্ত্তিত হয় বিসর্পিত লাস্যে। অর্দ্ধশতাব্দী আগে বিলাতী সভ্যতার সংস্পর্শে ও সংঘাতে আমাদের সামাজিক মনে যে আলোড়ন ও অভ্যুত্থানের সূচনা হয়েছিল,—তা' থেকেই বাঙ্গলা সাহিত্যের উদ্ভব। নবীন সাহিত্য তখন নববলে, দৃপ্তবেগে, সমাজের বুকে, ভেঙ্গে-চুরে গলিয়ে-গুলিয়ে, তাণ্ডবতালে নেচে গেয়ে নিজের পথ নিজেই তৈরি করে' নিয়েছিল,—কারও মুখ চায় নি, কোনো রাশ মানে নি!

আর এখন কালক্রমে সে স্পর্শ আমাদের অভ্যস্ত হয়ে গেছে, আমাদের সামাজিক মনের সে উত্তেজনা ও আবেগ অনেক কমে এসেছে;—তারি ফলে সাহিত্যের গতিও মন্দা হয়ে আসছে। সাহিত্য এখন প্রতি পদক্ষেপে সমাজের ঢাল-বিচার কর্‌ছে!—নিজের অধিকার অনধিকারের দর কষাকষি কর্‌ছে!—এ সব সাহিত্যের জড়তার লক্ষণ। যে অবস্থায় সাহিত্য কেবল সমাজকে পাশ কাটিয়েই যেতে চায়, নিজের উদ্ধত অধিকারের প্রেরণায় দেশ-কালের অতীত হতে পারে না, সে অবস্থায় তার কাছ থেকে বেশী কিছু চাওয়া দুরাশা!—আমাদের সাহিত্যের এখন সেই অবস্থা।

বাঙ্গালী আত্ম-বিস্মৃত জাতি কিনা, তা' বুঝ্‌তে হলে প্রত্নতত্ত্বের দলিল, আর পুরাবৃত্তের জবানবন্দির প্রয়োজন। কিন্তু বর্ত্তমানে বাঙ্গালী জাতি যে অত্যন্ত ক্ষুধিত, সে কথা জান্‌তে সাক্ষীসাবুদ্ তলবের কোনই দরকার করে না, পেটে হাত দিলেই তা' মালুম হয়ে যায়! আর সব ক্ষিদের মত আমাদের সাহিত্যের ক্ষিদেও যথেষ্ট প্রবল। আর এ বিষয়ে আমাদের আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত তীব্র;—তার কারণ ও রসের স্বাদ

আমরা ইতিপূর্ব্বে পেয়েছি। বর্ত্তমান সাহিত্য আমাদের নতুন করে' বিশেষ কিছুই দিতে পার্‌ছে না।—কাজেই তাকে নিয়ে আমাদের এমন টানাটানি ছেঁড়াছিঁড়ি লেগে গেছে! ক্ষিদের সময় খেতে না পেলে ছেলে মায়ের আঁচল ধরে টান্‌বেই!—বরং এমন টানাটানির সময়ে, একই দিক ধরে আমরা সবাই একযোগে যে একদিক পানেই টান্‌ছি নে, বঙ্গ সরস্বতীর পক্ষে পরম সৌভাগ্য না হলেও এই-ই যথা লাভ—অন্ততঃ মন্দের ভালো। আর, তা ছাড়া, ভাল-মন্দ'র ডিক্রি-ডিস্‌মিস্ যতই সোজাসুজি আমরা দিয়ে বসি না, সবসময়ে তা বাহাল থাকে না!—আজ আমাদের চোখে যা নেহাৎ খারাপ, কালে তা' থেকেই প্রচুর ভালোর সূত্রপাত হতে পারে। রাতের শেষে, উষার আগে, আঁধারের ধোঁয়া বেশী করে' ঘনিয়ে আসে।—কিন্তু সে কতক্ষণ!

অনাবশ্যক উৎপাত মনে করে, আজকে যার উচ্ছেদ-সাধনে আমরা উদ্যোগী হয়েছি, হয়ত তার'পরে ভিত্তি করেই আমাদের অলক্ষ্যে ও অজ্ঞাতে বঙ্গ-সাহিত্যের উন্নতির দ্বিতীয় স্তরের সূচনা হয়ে গেছে!

গ্রীষ্মের বিকেলে কাল-বৈশাখী যখন আমাদের খেলাধুলো সব মাটি করে দিয়ে, ঘরের দাবায় নজরবন্দী করে রেখে, আমাদেরই চোখের সাম্‌নে গোয়াল-ঘরের চালা উড়িয়ে, সুপুরিগাছের মাথা ভেঙ্গে, নানানরকম অনর্থপাত কর্‌তো, তখন মনে হতো,—বাঁশ-ঝাড়ের মাঝখানে মাথাউঁচু করে ঐ যে বড় তেঁতুল গাছটা রয়েছে ওরই এ সব কারসাজি! রাজ্যের যত ঝড়-দম্‌কা সব ওর কালো কালো ডালগুলোর মাঝে লুকিয়ে থাকে; আর খেয়াল হ'লেই এইরকম সব হাঙ্গামা বাধায়।—এ বিষয়ে সন্দেহ আমাদের মোটেই ছিল না; কারণ প্রমাণ যা ছিল, তা' স্পষ্টরকমে প্রত্যক্ষ।—ঝড়ের যত আস্ফালন,

যত দাপট্, সব ওই তেঁতুলগাছের ডালপালার ইসারাতেই হতো, তা আমরা বেশ দেখ্‌তে পেতাম। তার যত ডাক-হাঁক সব ঐ বাঁশ-ঝাড়ের ভিতর থেকেই আস্‌তো—তাতেও কোন সন্দেহ ছিল না! তখন মনে হতো তেঁতুলের গাছের গোড়া কেটে, অন্ততঃ মাথা মুড়িয়ে দিলেই, অতঃপর আর ঝড়ের আশঙ্কা থাক্‌বে না! এখন দেখে শুনে সে মত বদ্‌লাতে হয়েছে। এখন আমরা নিজেরাও বুঝি, ছেলেদেরও বুঝিয়ে থাকি যে, আবহাওয়ার যোগ-সাযোগেই ঝড় ঝাপটের উৎপত্তি হয়,—তেঁতুল গাছের মাথা মোড়ালে তার নিবৃত্তি বা উপশম কিছুই হয় না!

সব ঝড়ঝাপট্ সম্বন্ধেই ঐ এক কথা। ইদানীং আমাদের সাহিত্যে যে ঝড়-ঝাপ্‌টার আমদানী হয়েছে—তার মূলেও রয়েছে আমাদের দেশের আবহাওয়া। শিক্ষা দীক্ষার তারতম্যে আমাদের শিক্ষিত সমাজের চিন্তারাজ্যে কোথাও বা তাপ বেড়েছে, কোথাও বা চাপের মাত্রাধিক্য হয়েছে, তারি ফলে, আমাদের সাহিত্য-প্রকৃতির বর্ত্তমান অবস্থায় এ ঝড় ওঠা স্বাভাবিক, তাই ধীরে ধীরে এটা ঘনিয়ে উঠ্‌ছে।—বিশেষ করে কারো ঘাড়ে এর দোষ চাপিয়ে তার সম্বন্ধে কোনো সরাসরি হুকুম—মাথা ধর্‌লে মাথা কাট্‌বার ব্যবস্থার মতই সমীচীন হবে!

সাহিত্য-সম্মিলনের পক্ষে সাহিত্যসেবীদের সমাহার যতই অপরিহার্য্য হোক না—সাহিত্যসৃষ্টির কাজে দ্বন্দ্ব একরকম অনিবার্য্য। দেশের সবারি মন যে একই সময়ে একই সুরে বাঁধা থাক্‌বে, এমন আশা করা নিতান্তই অসঙ্গত। এই অভাবের 'পরেই ত সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা। বিদ্যার দৌড় আর বুদ্ধির ঝোঁক যদি সবারি সমান হতো;

সবাই যদি সব কথা একদিক দিয়ে আলোচনা করে একইরকম সিদ্ধান্তে উপনীত হতো; কিছুই অজানা বা গোপন থাক্‌বার সম্ভাবনা যদি না থাক্‌তো—তা হ'লে আর প্রকাশের উত্তেজনা কারো ভিতরে আস্‌তো না! অজ্ঞতার অন্ধকার, বা সন্দেহের গোধুলি না থাক্‌লে সাহিত্যের আলোক ফুট্‌তো না।

সাহিত্যিক ব্যাপারে দ্বন্দ্ব-বিরোধ শুধু অনিবার্য্য নয়—স্বাভাবিক এবং দরকারী।—বারুদ যদি খাঁটী হয়, তাহ'লে আশপাশের চাপে তার কার্য্যকারীতা বাড়ে বই কমে না। সাহিত্যিক বাদ-প্রতিবাদও যতই তীব্র আর একাগ্র হয়, মীমাংসাও ততই ঘনিয়ে আসে! তবে, সাহিত্যিক দ্বন্দ্বে অসহিষ্ণু বা অধীর হয়ে পড়্‌লে—অর্থাৎ এক কথায় মাথা ঠিক না রাখ্‌লে, কোনো মীমাংসাতেই পৌঁছনো সম্ভবপর হয় না—এ কথা সব সময়ে মনে রাখা উচিত।

তর্কের সময় মাথা অতিরিক্ত গরম হয়ে উঠ্‌লে, যা একটু-আধটু বস্তু ওখানে আছে তা বেবাক বাষ্পে পরিণত হয়; আর তার বহির্ম্মুখীন চাপ ঠেলে কোনো যুক্তিই ভিতরে ঢুক্‌তে পায় না। ব্যাপারটাকে মাঝে মাঝে নিষ্ঠা বলে ভুল হলেও, প্রকৃতপক্ষে এ গোঁড়ামি ছাড়া আর কিছুই নয়! নিষ্ঠার সংযম গোঁড়ামিতে থাকে না, আর গোঁড়ামির জ্বালা নিষ্ঠার রাজ্যে অচল। বর্ত্তমানে আমাদের সাহিত্যের অনেকটা শক্তিই ব্যয়িত হচ্ছে—এই গোঁড়ামির পোষণে এবং শাসনে।

সাহিত্যের গোঁড়ামি হচ্ছে—ভাবরাজ্যের দাসত্ব-প্রথা। সাহিত্য-সেবী মাত্রেরই উচিত নিজেকে এবং অপরকে এর বন্ধন থেকে যথা-সম্ভব মুক্ত রাখা। বুদ্ধিকে মতের দুয়োরে বদ্ধ রাখা আর যার পক্ষেই শ্রেয়ঃ হোক না, সাহিত্যিকের পক্ষে তা' মরণাধিক! দেশের মনকে

সজাগ এবং সচল রাখবার ভার স্বেচ্ছায় যাঁরা নিয়েছেন—তাঁরা নিজেরাই যদি মতের নেশায় অতি সামান্য কারণেই দিশেহারা হয়ে পড়েন—তা'হলে আর আমাদের আশা কোথায় ?

আশা করি আমার কথায় এমন কেউ মনে কর্‌বেন না যে, আমি সাহিত্যিকদের জন্যে, মতামতের উপদ্রবের বাইরে, কোনো অনির্দ্দিষ্ট ধূম্রলোকের ব্যবস্থা কর্‌ছি। আমি কেবল বল্‌তে চাই, তাঁদের বুদ্ধির অঙ্কুরগুলো সমস্তই যেন মত আঁক্‌ড়ে ধরেই নিশ্চিন্ত এবং নিশ্চেষ্ট না থাকে। একহাতে ঢাল, আরেক হাতে তলোয়ার সত্ত্বেও, সেপাইয়ের পক্ষে যুদ্ধ করা মাঝে মাঝে সম্ভব হয়; কিন্তু সাহিত্য রথীর সব হাতিয়ারই যদি তাঁর অরক্ষনীয় মতের পাহারায় নিয়োজিত থাকে, তাহলে প্রস্তাবিত অমতের আলোচনা তাঁর পক্ষে স্বভাবতঃই অসহনীয় হয়ে ওঠে।—আমাদেরও হয়েছে তাই। মত আমাদের এম্নি করেই পেয়ে বসেছে যে, মনন বা মনোনয়নের শক্তি এবং স্বাধীনতা কিছুই আর আমাদের নেই। এমন অবস্থা সাহিত্যের পক্ষে কল্যাণকর হতে পারে না !

গোঁড়ামির তাড়নায় আমরা অনেক সময়ে ভুলে যাই যে, এই পৃথিবীটা আমাদের গতিশীল।—কিছুই এখানে সুস্থির অবস্থায় নেই—কালের আবর্ত্তনে সবই পরিবর্ত্তিত হচ্ছে। আর, এই অবিরাম পরিবর্ত্তন-পরম্পরা হ'তে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে' মানব-সভ্যতার অব্যবহিত অতীত স্তরের ভিত্তির 'পরে নবতর এবং উন্নততর সোপানের প্রতিষ্ঠাই বর্ত্তমান মানবের লক্ষ্য।

নূতনের সৃষ্টিকে আমরা আমাদের লক্ষ্য করে নিই নি, পুরাতনের মধ্যে বুদ্ধির গোঁজামিলন দিতেই আমরা এখন ব্যস্ত আছি !

বর্ত্তমানের জন্যে ভাব্‌বার এবং কর্‌বার সামর্থ্য বা আত্মনির্ভর কিছুই আমাদের নেই; অথচ অতীতের জন্যে মাথাব্যথা আমাদের অসীম। অতীতের নীচে মাথা গুঁজে, আমরা গায়ের জোরে তাকে উন্নতিশীল বর্ত্তমানের সাথে সমপর্য্যায়ে রাখ্‌বার বৃথা চেষ্টায় গলদঘর্ম্ম হচ্ছি। ফলে, অতীতের উপযোগিতা একটুও বাড়্‌ছে না, কিন্তু তার চাপে আমাদের মাথাব্যথা ক্রমেই দুরারোগ্য হয়ে উঠ্‌ছে !

সামাজিক মনের এ ব্যাধি সাহিত্যের উন্নতির পরিপন্থী। সাহিত্য সৃষ্টির পক্ষে অতীত আমাদের সহায় না হয়ে অন্তরায় হয়েছে !—যা' আমাদের অতীতে নেই, তাকে আমরা করি অগ্রাহ্য; আর যার আলোচনা অতীতে হয়েছে, বর্ত্তমানে তা'তে হাত দেওয়া আমরা মনে করি ধৃষ্টতা ! লোক-সাহিত্যের কোনো বিভাগেই যেন আমাদের নতুন করে শোন্‌বার বা বলবার কিছুই নেই। আমাদের ভূতপূর্ব্ব শাস্ত্রকার এবং সাহিত্যিক সম্প্রদায় আমাদের সব বিষয়েরই শেষ কথা, সব অভিযোগেরই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করে দিয়ে গেছেন।—আমাদের কাজ হয়েছে শুধু মাঝে মাঝে তার ঝুল ঝেড়ে চূণ ফেরান ! তাঁরা আমাদের জন্যে যে আদর্শ, যে লক্ষ্য বাৎলে দিয়েছেন তা' থেকে চুল-মাত্রও এদিক ওদিক যেতে যদি কেউ ইঙ্গিত করে—তা'হলে সাহিত্য-সমাজে তার আর জল চলে না—কল্কে পাওয়া ত' অনেক দূরের কথা !

এমন বজ্র-আঁটুনী মাথা পেতে নেওয়া জীবিত সাহিত্যের পক্ষে কখনও সম্ভব হয় না। সাহিত্য-স্রোত সচল এবং সতেজ রাখ্‌তে হলে জলের অত বাছ্‌-বিচার চলে না !—ভাগিরথী যদি কেবল সাম-গান-পূতা সরস্বতী আর শ্যাম-বেণু-অনুকারী যমুনাকে কোল দিয়ে, ঘর্ঘরা, গণ্ডকী আদি করে সব অকুলীনদের প্রত্যাখ্যানে কর্‌তেন, তা হ'লে হয়ত

সগরবংশ উদ্ধারের ঢের আগেই বেহারের তাপদগ্ধ, পিপাসার্ত্ত কোনো জহ্নু-মুনি-নম্বর-দুই-এর জঠরে আবার তাঁকে অন্তর্হিত হতে হতো!

আজকাল বাঙ্গলা সাহিত্যের ভাব আর ভাষার চৌহদ্দি নির্দ্দেশ করতে যাঁরা ব্যস্ত, তাঁরা প্রায়ই এর গোড়ার কথাটি ভুলে যান। অতীতে যাঁদের প্রতিভার স্পর্শে আমাদের সাহিত্য নবকলেবর এবং শক্তিলাভ করেছিল—তাঁরা যথার্থ মুক্তপ্রাণ ছিলেন! জ্ঞানের রাজ্যে তাঁরা প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মাঝখানে কোনো প্রাচীর, হিন্দু-অহিন্দুর মাঝখানে কোনো পরিখা রচনা করেন নি! নিজ নিজ বুদ্ধির কষ্টি পাথরে পরখ করে যা'-কিছু মূল্যবান মনে করেছেন, তাই দিয়েই তাঁরা সমাজ এবং সাহিত্যকে অনুপ্রাণিত করেছেন। আমাদের সৌভাগ্য-ক্রমে সমাজকে তাঁরা স্বতঃসিদ্ধ ধরে নিয়ে সাহিত্য গড়তে বসেন নি।—আর সংস্কৃতমাত্রকেই শাস্ত্র, এবং শাস্ত্রমাত্রকেই অভ্রান্ত বলে' স্বীকার করে নিয়েও তাঁরা সাহিত্যের আসরে নামেন নি! এই স্বাধীনতা এবং আত্মনির্ভর তাঁদের ছিল বলেই বঙ্গ-সাহিত্য আজ বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে তার আসনের আশা পোষণ করে!

অনেক সময়ে আমাদের তথাকথিত সাহিত্যিক রক্ষণশীলতার সাফাই হিসেবে আমরা অতীত সাহিত্যিকগণের কথার অবতারণা করে থাকি। অন্ধের মুখে হাতীর বর্ণনার মতন, এই সব প্রতিভার আলোচনা আমাদের হাতে যা-ইচ্ছে-তাই হয়ে দাঁড়ায়। কারণ গোঁড়ামির মোহে আমরা আচ্ছন্ন! হোমিওপ্যাথিক ওষুধের গুণাগুণ নাকি ডাইল্যুসনের মাত্রাভেদে কম-বেশী হয়।—আমাদের মত হাতুড়ের হাতে পড়ে সাহিত্যিকদের গুণাগুণও স্থলভেদে সুবিধামাফিক কম-বেশী হয়েছে। কারণ দরকারমত আমরা সেগুলোকে আমাদের গোঁড়ামির

আরকে diluto করে নিতে ইতস্ততঃ করছিনে! এম্নি ধারা গো-বধের সময় খুড়ো কর্ত্তা করে আমরা নিজেরই মনের কথা পরের মুখে সাজিয়ে দিচ্ছি।

এতে করে সাহিত্যিক আলোচনা একটুও এগোচ্ছে না! অতীতের সাক্ষী যদি নিতান্তই আমাদের নিতে হয়—তবে তাকে সমগ্রভাবে দেখতে হবে। তার সাথে একপ্রাণ হয়ে তার কথা বুঝতে হবে। আগে-ভাগে নিজের রায় ঠিক করে ফেলে—পরিশেষে অতীতের সাক্ষী তলব করে— তা থেকে যতটুকু রায়ের অনুকূল তাই ছেঁটে কেটে নিলে—কোনোই ফল হবে না,—আমাদের সত্য-নিষ্ঠাও ক্ষুণ্ণ হবে।

আর, তা ছাড়া, অতীতের ডিক্রি ডিস্‌মিসের পরে যে আর আপীল চলবে না—এমন কথা মেনে নেওয়া শক্ত। "অতীতের তাঁরা সব ছিলেন হাতী ঘোড়া, আর বর্ত্তমানের আমরা হচ্চি তার চেয়ে নিকৃষ্ট স্তরের প্রাণী" এ কথা যিনি বলেন, তাঁর সাথে এক পর্য্যায়ভুক্ত হতে, আমার বিশ্বাস, অনেকেরই আপত্তি হবে।

শ্রীবরদা চরণ গুপ্ত।

বৈশাখ, ১৩২৪।

জাপানের কথা।

এসিয়ার মধ্যে জাপানই এই কথাটি একদিন হঠাৎ অনুভব করলে যে, য়ুরোপ যে-শক্তিতে পৃথিবীতে সর্ব্বজয়ী হয়ে উঠেচে, একমাত্র সেই শক্তির দ্বারাই তাকে ঠেকানো যায়। নইলে তার চাকার নীচে পড়তেই হবে—এবং একবার পড়লে কোনকালে আর ওঠবার উপায় থাক্‌বেনা।

এই কথাটি যেম্‌নি তার মাথায় ঢুক্‌ল, অম্‌নি সে আর এক মুহূর্ত্ত দেরি করলে না। কয়েক বৎসরের মধ্যেই য়ুরোপের শক্তিকে আত্মসাৎ করে নিলে। য়ুরোপের কামান বন্দুক, কুচ-কাওয়াজ, কল কারখানা, আপিস আদালত, আইন কানুন, যেন কোন্ আলাদ্দিনের প্রদীপের জাদুতে পশ্চিমলোক থেকে পূর্ব্বলোকে একেবারে আস্ত উপ্‌ড়ে এনে বসিয়ে দিলে। নতুন শিক্ষাকে ক্রমে ক্রমে সইয়ে নেওয়া, বাড়িয়ে তোলা নয়; তাকে ছেলের মত শৈশব থেকে যৌবনে মানুষ করে তোলা নয়;—তাকে জামাইয়ের মত একেবারে পূর্ণ যৌবনে ঘরের মধ্যে বরণ করে নেওয়া। বৃদ্ধ বনস্পতিকে এক জায়গা থেকে তুলে আর এক জায়গায় রোপন করবার বিদ্যা জাপানের মালীরা জানে—য়ুরোপের শিক্ষাকেও তারা তেমনি করেই তার সমস্ত জটিল শিকড় এবং বিপুল ডালপালা সমেত নিজের দেশের মাটিতে এক রাত্রির মধ্যেই খাড়া করে দিলে। শুধু যে তার পাতা ঝরে' পড়ল

না তা নয়,—পরদিন থেকেই তার ফল ধরতে লাগ্‌ল। প্রথম কিছু-দিন এরা য়ুরোপ থেকে শিক্ষকের দল ভাড়া করে এনেছিল। অতি অল্পকালের মধ্যেই তাদের প্রায় সমস্ত সরিয়ে দিয়ে, হালে এবং দাঁড়ে নিজেরাই বসে গেছে—কেবল পালটা এমন আড় করে ধরেচে যাতে পশ্চিমের হাওয়াটা তার উপরে পূরো এসে লাগে।

ইতিহাসে এত বড় আশ্চর্য্য ঘটনা আর কখনো হয় নি। কারণ, ইতিহাস ত যাত্রার পালা গান করা নয় যে, ষোলো বছরের ছোকরাকে পাকা গোঁপদাড়ি পরিয়ে দিলেই সেই মুহূর্ত্তে তাকে নারদমুনি করে তোলা যেতে পারে! শুধু য়ুরোপের অস্ত্র ধার করলেই যদি য়ুরোপ হওয়া যেত, তাহলে আফগানিস্থানেরও ভাবনা ছিল না। কিন্তু য়ুরোপের আসবাবগুলো ঠিকমত ব্যবহার করবার মত মনোবৃত্তি জাপান এক নিমেষেই কেমন করে গড়ে তুল্লে, সেইটেই বোঝা শক্ত।

সুতরাং এ কথা মান্‌তেই হবে, এ জিনিস তাকে গোড়া থেকে গড়তে হয় নি,—ওটা তার একরকম গড়াই ছিল। সেই জন্যেই যেম্‌নি তার চৈতন্য হল, অমনি তার প্রস্তুত হতে বিলম্ব হল না। তার যা-কিছু বাধা ছিল, সেটা বাইরের—অর্থাৎ একটা নতুন জিনিসকে বুঝে পড়ে আয়ত্ত করে নিতে যেটুকু বাধা, সেইটুকু মাত্র;—তার নিজের অন্তরে কোনো বিরোধের বাধা ছিল না।

পৃথিবীতে মোটামুটি দু'রকম জাতের মন আছে—এক স্থাবর, আর এক জঙ্গম। এই মানসিক স্থাবর-জঙ্গমতার মধ্যে একটা একান্ত ভেদ আছে, এমন কথা বল্‌তে চাই নে। স্থাবরকেও দায়ে পড়ে চল্‌তে হয়, জঙ্গমকেও দায়ে পড়ে দাঁড়াতে হয়। কিন্তু স্থাবরের লয় বিলম্বিত, আর জঙ্গমের লয় দ্রুত।

জাপানের মনটাই ছিল স্বভাবত জঙ্গম—লম্বা লম্বা দশকুশি তালের গাম্ভারি চাল তার নয়। এই জন্যে সে এক দৌড়ে দু' তিন শো বছর হু হু করে পেরিয়ে গেল। আমাদের মত যারা দুর্ভাগ্যের বোঝা নিয়ে হাজার বছর পথের ধারে বটতলায় শুয়ে গড়িয়ে কাটিয়ে দিচ্চি, আমরা অভিমান করে বলি, "ওরা ভারি হাল্‌কা; আমাদের মত গাম্ভীর্য্য থাক্‌লে ওরা এমন বিশ্রীরকম দৌড়ধাপ করতে পারত না। সাঁচ্চা জিনিস কখনও এত শীঘ্র গড়ে উঠ্‌তে পারে না।"

আমরা যাই বলি না কেন, চোখের সাম্‌নে স্পষ্ট দেখতে পাচ্চি এসিয়ার এই প্রান্তবাসী জাত য়ুরোপীয় সভ্যতার সমস্ত জটিল ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ জোরের সঙ্গে এবং নৈপুণ্যের সঙ্গে ব্যবহার করতে পারচে। এর একমাত্র কারণ, এরা যে কেবল ব্যবস্থাটাকেই নিয়েচে তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে মনটাকেও পেয়েচে। নইলে পদে পদে অস্ত্রের সঙ্গে অস্ত্রীর বিষম ঠোকাঠুকি বেধে যেত, নইলে ওদের শিক্ষার সঙ্গে দীক্ষার লড়াই কিছুতেই মিট্‌ত না, এবং বর্ম্ম ওদের দেহটাকে দিত পিষে।

মনের যে জঙ্গমতার জোরে ওরা আধুনিক কালের প্রবল প্রবাহের সঙ্গে নিজের গতিকে এত সহজে মিলিয়ে দিতে পেরেচে, সেটা জাপানী পেয়েচে কোথা থেকে?

জাপানীদের মধ্যে একটা প্রবাদ আছে যে, ওরা মিশ্র জাতি। ওরা একেবারে খাস মঙ্গোলীয় নয়। এমন কি, ওদের বিশ্বাস ওদের সঙ্গে আর্য্যরক্তেরও মিশ্রন ঘটেচে। জাপানীদের মধ্যে মঙ্গোলীয় এবং ভারতীয় দুই ছাঁদেরই মুখ দেখতে পাই, এবং ওদের মধ্যে বর্ণেরও বৈচিত্র্য যথেষ্ট আছে। আমার চিত্রকর বন্ধু টাইকানকে বাঙ্গালী

কাপড় পরিয়ে দিলে, তাঁকে কেউ জাপানী বলে সন্দেহ করবে না। এমন আরো অনেককে দেখেচি।

যে জাতির মধ্যে বর্ণসঙ্করতা খুব বেশী ঘটেচে, তার মনটা এক ছাঁচে ঢালাই হয়ে যায় না। প্রকৃতি-বৈচিত্র্যের সংঘাতে তার মনটা চলনশীল হয়ে থাকে। এই চলনশীলতায় মানুষকে অগ্রসর করে, এ কথা বলাই বাহুল্য।

রক্তের অবিমিশ্রতা কোথাও যদি দেখ্‌তে চাই, তাহলে বর্ব্বর জাতির মধ্যে যেতে হয়। তারা পরকে ভয় করেচে, তারা অল্প-পরিসর আশ্রয়ের মধ্যে লুকিয়ে লুকিয়ে নিজের জাতকে স্বতন্ত্র রেখেচে। তাই আদিম অষ্ট্রেলীয় জাতির আদিমতা আর ঘুচল না—আফ্রিকার মধ্যদেশে কালের গতি বন্ধ বল্লেই হয়।

কিন্তু গ্রীস পৃথিবীর এমন একটা জায়গায় ছিল, যেখানে একদিকে এসিয়া, একদিকে ইজিপ্ট, একদিকে য়ুরোপের মহাদেশ তার সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে তাকে আলোড়িত করেচে। গ্রীকেরা অবিমিশ্র জাতি ছিল না—রোমকেরাও না। ভারতবর্ষেও দ্রাবিড়ে আর্য্যে যে মিশ্রন ঘটেছিল, সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই।

জাপানীকেও দেখ্‌লে মনে হয়, তারা এক ধাতুতে গড়া নয়। পৃথিবীর অধিকাংশ জাতিই মিথ্যা করেও আপনার রক্তের অবি-মিশ্রতা নিয়ে গর্ব্ব করে—জাপানীর মনে এই অভিমান কিছুমাত্র নেই। জাপানীদের সঙ্গে ভারতীয় জাতির মিশ্রন হয়েচে, এ কথার আলোচনা তাদের কাগজে দেখেচি, এবং তা নিয়ে কোনো পাঠক কিছুমাত্র বিচলিত হয় নি। শুধু তাই নয়, চিত্রকলা প্রভৃতি সম্বন্ধে ভারতবর্ষের কাছে তারা যে ঋণী, সে কথা আমরা একেবারেই ভুলে

গেচি—কিন্তু জাপানীরা এই ঋণ স্বীকার করতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না।

বস্তুত ঋণ তারাই গোপন করতে চেষ্টা করে, ঋণ যাদের হাতে ঋণই রয়ে গেছে, ধন হয়ে ওঠে নি। ভারতের কাছ থেকে জাপান যদি কিছু নিয়ে থাকে, সেটা সম্পূর্ণ তার আপন সম্পত্তি হয়েচে। যে-জাতির মনের মধ্যে চলন-ধর্ম্ম প্রবল, সেই জাতিই পরের সম্পদকে নিজের সম্পদ করে নিতে পারে। যার মন স্থাবর, বাইরের জিনিস তার পক্ষে বিষম ভার হয়ে ওঠে; কারণ, তার নিজের অচল অস্তিত্বই তার পক্ষে প্রকাণ্ড একটা বোঝা।

কেবলমাত্র জাতি-সঙ্করতা নয়, স্থান-সঙ্কীর্ণতা জাপানের পক্ষে একটা মস্ত সুবিধা হয়েচে। ছোট জায়গাটি সমস্ত জাতির মিলনের পক্ষে পুটপাকের কাজ করেচে। বিচিত্র উপকরণ ভালরকম করে গলে' মিলে বেশ নিবিড় হয়ে উঠেচে। চীন বা ভারতবর্ষের মত বিস্তীর্ণ জায়গায়, বৈচিত্র্য কেবল বিভক্ত হয়ে উঠ্‌তে চেষ্টা করে, সংহত হতে চায় না।

প্রাচীনকালে গ্রীস, রোম, এবং আধুনিক কালে ইংলণ্ড সঙ্কীর্ণ স্থানের মধ্যে সম্মিলিত হয়ে বিস্তীর্ণ স্থানকে অধিকার করতে পেরেচে। আজকের দিনে এসিয়ার মধ্যে জাপানের সেই সুবিধা। একদিকে তার মানসপ্রকৃতির মধ্যে চিরকালই চলন-ধর্ম্ম আছে, যে জন্য চীন কোরিয়া প্রভৃতি প্রতিবেশীর কাছ থেকে জাপান তার সভ্যতার সমস্ত উপকরণ অনায়াসে আত্মসাৎ করতে পেরেচে; আর একদিকে অল্প পরিসর জায়গায় সমস্ত জাতি অতি সহজেই এক ভাবে ভাবিত, এক প্রাণে অনুপ্রাণিত হতে পেরেচে। তাই যে-মুহূর্ত্তে জাপানের

মস্তিষ্কের মধ্যে এই চিন্তা স্থান পেলে যে, আত্মরক্ষার জন্যে য়ুরোপের কাছ থেকে তাকে দীক্ষা গ্রহণ করতে হবে, সেই মুহূর্ত্তে জাপানের সমস্ত কলেবরের মধ্যে অনুকূল চেষ্টা জাগ্রত হয়ে উঠ্‌ল।

য়ুরোপের সভ্যতা একান্ত ভাবে জঙ্গম মনের সভ্যতা, তা স্থাবর মনের সভ্যতা নয়। এই সভ্যতা ক্রমাগতই নূতন চিন্তা, নূতন চেষ্টা, নূতন পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে বিপ্লব-তরঙ্গের চূড়ায় চূড়ায় পক্ষ বিস্তার করে উড়ে চলেচে। এসিয়ার মধ্যে একমাত্র জাপানের মনে সেই স্বাভাবিক চলন-ধর্ম্ম থাকাতেই, জাপান সহজেই য়ুরোপের ক্ষিপ্রতালে চল্‌তে পেরেচে, এবং তাতে-করে তাকে প্রলয়ের আঘাত সইতে হয় নি। কারণ, উপকরণ সে যা-কিছু পাচ্চে, তার দ্বারা সে সৃষ্টি করচে; সুতরাং নিজের বর্দ্ধিষ্ণু জীবনের সঙ্গে এ সমস্তকে সে মিলিয়ে নিতে পারচে। এই সমস্ত নতুন জিনিস যে তার মধ্যে কোথাও কিছু বাধা পাচ্চে না, তা নয়,—কিন্তু সচলতার বেগেই সেই বাধা ক্ষয় হয়ে চলেচে। প্রথম প্রথম যা অসঙ্গত অদ্ভুত হয়ে দেখা দিচ্চে, ক্রমে ক্রমে তার পরিবর্ত্তন ঘটে সুসঙ্গতি জেগে উঠচে। একদিন যে-অনাবশ্যককে সে গ্রহণ করেচে, আর একদিন সেটাকে ত্যাগ করচে—একদিন যে আপন জিনিসকে পরের হাটে সে খুইয়েচে, আর একদিন সেটাকে আবার ফিরে নিচ্চে। এই তার সংশোধনের প্রক্রিয়া এখনো নিত্য তার মধ্যে চল্‌চে। যে বিকৃতি মৃত্যুর, তাকেই ভয় করতে হয়—যে বিকৃতি প্রাণের লীলাবৈচিত্র্যে হঠাৎ এক-এক সময়ে দেখা দেয়, প্রাণ আপনি তাকে সাম্‌লে নিয়ে নিজের সমে এসে দাঁড়াতে পারে।

আমি যখন জাপানে ছিলুম, তখন একটা কথা বারবার আমার মনে এসেচে। আমি অনুভব করছিলুম, ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙালীর সঙ্গে

জাপানীর এক জায়গায় যেন মিল আছে। আমাদের এই বৃহৎ দেশের মধ্যে বাঙালীই সব প্রথমে নূতনকে গ্রহণ করেচে, এবং এখনো নূতনকে গ্রহণ ও উদ্ভাবন করবার মত তার চিত্তের নমনীয়তা আছে।

তার একটা কারণ, বাঙালীর মধ্যে রক্তের অনেক মিশল ঘটেচে; এমন মিশ্রণ ভারতের আর কোথাও হয়েচে কিনা সন্দেহ। তারপরে বাঙালী ভারতের যে প্রান্তে বাস করে, সেখানে বহুকাল ভারতের অন্য প্রদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। বাংলা ছিল পাণ্ডব-বর্জ্জিত দেশ। বাংলা একদিন দীর্ঘকাল বৌদ্ধপ্রভাবে, অথবা অন্য যে কারণেই হোক, আচারভ্রষ্ট হয়ে নিতান্ত এক-ঘরে হয়েছিল—তাতে করে' তার একটা সঙ্কীর্ণ স্বাতন্ত্র্য ঘটেছিল। এই কারণেই বাঙালীর চিত্ত অপেক্ষাকৃত বন্ধনমুক্ত, এবং নূতন শিক্ষা গ্রহণ করা বাঙালীর পক্ষে যত সহজ হয়েছিল, এমন ভারতবর্ষের অন্য কোনো দেশের পক্ষে হয় নি। য়ুরোপীয় সভ্যতার পূর্ণ দীক্ষা জাপানের মত আমাদের পক্ষে অবাধ নয়; পরের কৃপণ হস্ত থেকে আমরা যেটুকু পাই, তার বেশী আমাদের পক্ষে দুর্লভ। কিন্তু য়ুরোপীয় শিক্ষা আমাদের দেশে যদি সম্পূর্ণ সুগম হত, তাহলে কোনো সন্দেহ নেই, বাঙালী সকল দিক থেকেই তা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করত। আজ নানাদিক থেকে বিদ্যাশিক্ষা আমাদের পক্ষে ক্রমশই দুর্মূল্য হয়ে উঠচে—তবু বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্কীর্ণ প্রবেশদ্বারে বাঙালীর ছেলে প্রতিদিন মাথা-খোঁড়াখুড়ি করে মরচে। বস্তুত ভারতের অন্য সকল প্রদেশের চেয়ে বাংলাদেশে যে-একটা অসন্তোষের লক্ষণ অত্যন্ত প্রবল দেখা যায়, তার একমাত্র কারণ আমাদের প্রতিহত গতি। যা-কিছু ইংরেজি, তার দিকে বাঙালীর উদ্বোধিত চিত্ত একান্ত প্রবলবেগে ছুটেছিল; ইংরেজের অত্যন্ত কাছে

যাবার জন্যে আমরা প্রস্তুত হয়েছিলুম—এ সম্বন্ধে সকলরকম সংস্কারের বাধা লঙ্ঘন করবার জন্যে বাঙালীই সর্ব্বপ্রথমে উদ্যত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এইখানে ইংরেজের কাছেই যখন বাধা পেল, তখন বাঙালীর মনে যে প্রচণ্ড অভিমান জেগে উঠ্‌ল—সেটা হচ্চে তার অনুরাগেরই বিকার।

এই অভিমানই আজ নবযুগের শিক্ষাকে গ্রহণ করবার পক্ষে বাঙালীর মনে সকলের চেয়ে বড় অন্তরায় হয়ে উঠেচে। আজ আমরা যে সকল কূটতর্ক ও মিথ্যা যুক্তি দ্বারা পশ্চিমের প্রভাবকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করবার চেষ্টা কর্‌চি, সেটা আমাদের স্বাভাবিক নয়। এইজন্যেই সেটা এমন সুতীব্র—সেটা ব্যাধির প্রকোপের মত পীড়ার দ্বারা এমন করে আমাদের সচেতন করে তুলেচে।

বাঙালীর মনের এই প্রবল বিরোধের মধ্যেও তার চলন-ধর্ম্মই প্রকাশ পায়। কিন্তু বিরোধ কখনো কিছু সৃষ্টি করতে পারে না। বিরোধে দৃষ্টি কলুষিত ও শক্তি বিকৃত হয়ে যায়। যত বড় বেদনাই আমাদের মনে থাক্, এ কথা আমাদের ভুল্‌লে চলবে না যে, পূর্ব্ব ও পশ্চিমের মিলনের সিংহদ্বার উদ্‌ঘাটনের ভার বাঙালীর উপরেই পড়েচে। এইজন্যেই বাংলার নবযুগের প্রথম পথপ্রবর্ত্তক রামমোহন রায়। পশ্চিমকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে তিনি ভীরুতা করেন নি, কেননা পূর্ব্বের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা অটল ছিল। তিনি যে-পশ্চিমকে দেখতে পেয়েছিলেন, সে ত শস্ত্রধারী পশ্চিম নয়, বাণিজ্যজীবী পশ্চিম নয়—সে হচ্চে জ্ঞানে প্রাণে উদ্ভাসিত পশ্চিম।

জাপান য়ুরোপের কাছ থেকে কর্ম্মের দীক্ষা এবং অস্ত্রের দীক্ষা গ্রহণ করেচে। তার কাছ থেকে বিজ্ঞানের শিক্ষাও সে লাভ করতে

বসেচে। কিন্তু আমি যতটা দেখেচি, তাতে আমার মনে হয় য়ুরোপের সঙ্গে জাপানের একটা অন্তরতর জায়গায় অনৈক্য আছে। যে গূঢ় ভিত্তির উপরে য়ুরোপের মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত, সেটা আধ্যাত্মিক। সেটা কেবলমাত্র কর্ম্মনৈপুণ্য নয়, সেটা তার নৈতিক আদর্শ। এইখানে জাপানের সঙ্গে য়ুরোপের মূলগত প্রভেদ। মনুষ্যত্বের যে-সাধনা অমৃত লোককে মানে, এবং সেই অভিমুখে চলতে থাকে, যে-সাধনা কেবলমাত্র সামাজিক ব্যবস্থার অঙ্গ নয়, যে-সাধনা সাংসারিক প্রয়োজন বা স্বজাতিগত স্বার্থকেও অতিক্রম করে আপনার লক্ষ্য স্থাপন করেচে,—সেই সাধনার ক্ষেত্রে ভারতের সঙ্গে য়ুরোপের মিল যত সহজ, জাপানের সঙ্গে তার মিল তত সহজ নয়। জাপানী সভ্যতার সৌধ এক-মহলা—সেই হচ্চে তার সমস্ত শক্তি এবং দক্ষতার নিকেতন। সেখানকার ভাণ্ডারে সব চেয়ে বড় জিনিস যা সঞ্চিত হয়, সে হচ্চে কৃতকর্ম্মতা,—সেখানকার মন্দিরে সব চেয়ে বড় দেবতা স্বাদেশিক স্বার্থ। জাপান তাই সমস্ত য়ুরোপের মধ্যে সহজেই আধুনিক জর্ম্মণির শক্তি-উপাসক নবীন দার্শনিকদের কাছ থেকে মন্ত্র গ্রহণ করতে পেরেচে; নীট্‌ঝের গ্রন্থ তাদের কাছে সব চেয়ে সমাদৃত। তাই আজ পর্য্যন্ত জাপান ভাল করে স্থির করতেই পারলে না—কোনো ধর্ম্মে তার প্রয়োজন আছে কিনা, এবং ধর্ম্মটা কি। কিছু-দিন এমনও তার সঙ্কল্প ছিল যে, সে খৃষ্টানধর্ম্ম গ্রহণ করবে। তখন তার বিশ্বাস ছিল যে, য়ুরোপ যে-ধর্ম্মকে আশ্রয় করেচে, সেই ধর্ম্ম হয়ত তাকে শক্তি দিয়েচে—অতএব খৃষ্টানীকে কামানবন্দুকের সঙ্গে সঙ্গেই সংগ্রহ করা দরকার হবে। কিন্তু আধুনিক য়ুরোপে শক্তি-উপাসনার সঙ্গে সঙ্গে কিছুকাল থেকে এই কথাটা ছড়িয়ে পড়েচে যে,

খৃষ্টানধর্ম্ম স্বভাবদুর্ব্বলের ধর্ম্ম, তা বীরের ধর্ম্ম নয়। য়ুরোপ বল্‌তে সুরু করেছিল—যে-মানুষ ক্ষীণ, তারই স্বার্থ নম্রতা, ক্ষমা ও ত্যাগধর্ম্ম প্রচার করা। সংসারে যারা পরাজিত, সে-ধর্ম্মে তাদেরই সুবিধা; সংসারে যারা জয়শীল, সে-ধর্ম্মে তাদের বাধা। এই কথাটা জাপানের মনে সহজেই লেগেচে। এইজন্যে জাপানের রাজশক্তি আজ মানুষের ধর্ম্মবুদ্ধিকে অবজ্ঞা করচে। এই অবজ্ঞা আর কোনো দেশে চল্‌তে পারত না; কিন্তু জাপানে চল্‌তে পারচে, তার কারণ জাপানে এই বোধের বিকাশ ছিল না, এবং সেই বোধের অভাব নিয়েই জাপান আজ গর্ব্ব বোধ করচে—সে জান্‌চে পরকালের দাবী থেকে সে মুক্ত, এইজন্যই ইহকালে সে জয়ী হবে।

জাপানের কর্ত্তৃপক্ষেরা যে ধর্ম্মকে বিশেষরূপে প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন, সে হচ্চে শিন্তো ধর্ম্ম। তার কারণ এই ধর্ম্ম কেবলমাত্র সংস্কার মূলক; আধ্যাত্মিকতামূলক নয়। এই ধর্ম্ম রাজাকে এবং পূর্ব্ব-পুরুষদের দেবতা বলে মানে। সুতরাং স্বদেশাসক্তিকে সুতীব্র করে তোলবার উপায়রূপে এই সংস্কারকে ব্যবহার করা যেতে পারে।

কিন্তু য়ুরোপীয় সভ্যতা মঙ্গোলীয় সভ্যতার মত এক-মহলা নয়। তার একটি অন্তরমহল আছে। সে অনেক দিন থেকেই Kingdom of Heavenকে স্বীকার করে আস্‌চে। সেখানে নম্র যে, সে জয়ী হয়; পর যে, সে আপনার চেয়ে বেশী হয়ে ওঠে। কৃতকর্ম্মতা নয়, পরমার্থই সেখানে চরম সম্পদ। অনন্তের ক্ষেত্রে সংসার সেখানে আপনার সত্য মূল্য লাভ করে।

য়ুরোপীয় সভ্যতার এই অন্তরমহলের দ্বার কখনো কখনো বন্ধ হয়ে যায়, কখনো কখনো সেখানকার দীপ জ্বলে না। তা হোক্,

কিন্তু এ মহলের পাকা ভিৎ,—বাইরের কামান গোলা এর দেয়াল ভাঙতে পারবে না—শেষ পর্য্যন্তই এ টিঁকে থাক্‌বে, এবং এইখানেই সভ্যতার সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে।

আমাদের সঙ্গে য়ুরোপের আর কোথাও মিল যদি না থাকে, এই বড় জায়গায় মিল আছে। আমরা অন্তরতর মানুষকে মানি—তাকে বাইরের মানুষের চেয়ে বেশী মানি। যে জন্ম মানুষের দ্বিতীয় জন্ম, তার মুক্তির জন্ম, তার জন্যে আমরা বেদনা অনুভব করি। এই জায়গায়, মানুষের এই অন্তরমহলে, য়ুরোপের সঙ্গে আমাদের যাতায়াতের একটা পথচিহ্ন দেখ্‌তে পাই। এই অন্তরমহলে মানুষের যে-মিলন, এই মিলনই সত্য মিলন। এই মিলনের দ্বার উদ্‌ঘাটন করবার কাজে বাঙ্গালীর আহ্বান আছে, তার অনেক চিহ্ন অনেকদিন থেকেই দেখা যাচ্চে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভাষার কথা।

—ঃ*ঃ—

চৈত্রের সবুজপত্রে ভাষার সম্বন্ধে দুইটী প্রবন্ধ পড়িলাম। ভাষার কথা বহুদিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি, কিছু বলিবার ইচ্ছা বা প্রয়াস হয় নাই। এই সম্বন্ধে আমার মনে একটা সনাতন জড়তা আছে, এবং আমার বিশ্বাস খুঁজিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে আমার মত দশাগ্রস্থ লোকের সংখ্যা কম নহে। এই বিষয়ে পরমহংস দেবের সুপরিচিত উক্তি মনে জাগিয়া আছে;—ভোজের সময় ততক্ষণই গোলমাল হয় যতক্ষণ পাত খালি থাকে,—পাত ভর্ত্তি হইবামাত্র বাজে কথা থামিয়া যায়। ভাষা লইয়া এত যে গোলমাল চেচামেচি চলিতেছে ইহা কাণে শুনিতে পাইতেছি বটে, কিন্তু মনে ঠিক যেন যাইয়া পৌঁছিতেছে না। মনে হইতেছে এ বেবাক বাজে বকা, কেহই ঠিক জিনিসটী খুঁজিয়া পাইতেছেন না, পথে দাঁড়াইয়া মেলা কোলাহল বাঁধাইয়া দিয়াছেন। ঠিক জিনিসটী পাইবামাত্র সমস্ত কোলাহল অতিক্রম করিয়া আনন্দধ্বনি উঠিবে। পূজনীয় রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ পড়িয়া মনে হইল,—এ কোলাহল নহে, ওকালতি নহে, দলাদলি মোটেই না, এ সত্যানুসন্ধানের চেষ্টা; এ বিষয়ে প্রবন্ধ যত পড়িয়াছি, সবটাতেই ওকালতি দলাদলির গন্ধ পাইয়াছি। অবশ্য আমার নাসিকা যে সুস্থ, এমন স্পর্দ্ধা আমি কি করিয়া করি? তবে আপনার মতের উপর আপনার পুত্রের চেয়ে কম মায়া থাকে না,

এবং এই দুর্ব্বলতা বিতর্ককালে তীক্ষ্ণধী ন্যায়পর ব্যক্তির বিচারবুদ্ধিকে পর্য্যন্ত অল্পাধিক মেঘাবৃত করিয়া রাখে। তাই মনে রাখিয়া এই জাতীয় প্রবন্ধ পড়িয়া কোনটাকে অবহেলার যোগ্য বলিয়া মনে হইয়াছে, কোনটা আবার শুধুই বিদ্রোহ ও ক্ষোভ জাগাইয়াছে, কিন্তু একটায়ও বিচলিত করিতে পারে নাই। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ পড়িয়া মনে হইল, অভিসার মঙ্গলের দিকে—ইহা এই পক্ষের উকীল বা ঐ পক্ষের উকীলের লেখা নহে, দু'পক্ষেরই হিতৈষীর সসঙ্কোচ আবেদন। ঢাকা সাহিত্যসমাজের এক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেন "ভাষার আকার ও বিকার" নামক এক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, ঢাকা রিভিউতে তাহা প্রকাশিত হইয়াছিল; তাহাতে মাত্র একবার তুল্যরূপ সমদর্শিতার ও সত্যানুসন্ধানচেষ্টার সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম।

শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দাসগুপ্ত মহাশয় বরিশাল হইতে যে "পূর্ব্ববঙ্গের উক্তি" পাঠাইয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, তাহা পত্রিকায় স্থানদান করিয়া সবুজ পত্র সম্পাদক সুরুচির পরিচয় প্রদান করেন নাই।

ভাষার কথা আমি অতি সংক্ষেপে আলোচনা করিতে চাই, এবং যথাশক্তি মন খোলসা রাখিয়া আলোচনা করিতে চাই। এই বিষয়ে বক্তব্য এতই অল্প যে, কয়েকটা সূত্রাকারে বোধহয় আসল কথা কয়টা বলা যায়।

১। একটা জাতির কথিত ভাষাই হউক আর লিখিত ভাষাই হউক, তাহা কাহারও কথায় বা লেখায় ধাঁ করিয়া বদলিয়া যায় না, তা সেই বক্তা বা লেখক যত শক্তিশালী বা দেশমান্য হউন না কেন।

শক্তিশালী লেখক ও বক্তাগণ পন্থা নির্দ্দেশ করেন, এবং নিজেরা সেই পথে চলিয়া সেই পথের সুগমতা, আপদহীনতা ইত্যাদির উদাহরণ দেখান। দেশের লোক বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দীর্ঘকাল পরে সেই পথে চলিতে আরম্ভ করে।

২। বাঙ্গলা দেশের প্রত্যন্তস্থিত জেলার শিক্ষিত লোকেরও মুখের ভাষা বদলিতে আরম্ভ করিয়াছে, এবং ধীরে ধীরে তাহা এক কথ্য ভাষা গঠনের দিকে অগ্রসর হইতেছে। এই অদলবদল চুয়াইয়া যে সার বাহির হইতেছে, তাহা অপ্রতিরোধ্যরূপে লিখিত ভাষায় ঢুকিয়া তাহাকে ক্রমশঃই আদিযুগের সংস্কৃত-ভাঙ্গা বাঙ্গলা হইতে পৃথক করিয়া দিতেছে।

৩। উপরোক্ত প্রথায় ধীরে ধীরে লিখিত ও কথিত ভাষার ব্যবধান কমিয়া যাইতেছে, এবং কালে উভয়ে মিলিত হইয়া যে আদর্শ ভাষার সৃষ্টি হইবে, তাহার দিকে সমস্ত বাঙ্গলা দেশের লিখিত ও কথিত ভাষা অগ্রসর হইতেছে। এই ভাষা যখন গড়িয়া উঠিবে, তখন ইহাকে কোনও বিশেষ স্থানের ভাষা বলিয়া সনাক্ত করা কঠিন হইবে; তবে ক্রিয়াপদের গঠনে রাজধানীর প্রভাব সুস্পষ্ট থাকা অনিবার্য্য। এই ভাষা এখনও গড়িয়া উঠে নাই।

৪। এই ভাষা যখন গড়িয়া উঠিবে, তখন কাহাকেও ইহা গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিতে হইবে না। সকলে নিজের অজ্ঞাতসারে ইহা আপনা হইতেই গ্রহণ করিবে।

৫। তাহার পূর্ব্বে যদি কেহ বলেন যে, কথ্য ভাষায়ই লিখিতে হইবে, তবে সেই বাজে কথা কেহ শুনিবে না। আবার কেহ যদি বলেন যে, কেতাবী ভাষা ছাড়া লিখিলে পড়িব না, তবে তাহারই

ঘরের ভাত বেশী করিয়া খাওয়া দরকার হইবে। এই বিষয়ে যেই পক্ষ যত জোরে কথা কহিবেন, সেই পক্ষেরই কথা তত ফাঁকা ও বেমানান হইবে। এমত অবস্থায় স্থীরধীর বক্তব্য এই যে, কথ্য ভাষায়ই লিখ আর সাধু ভাষায়ই লিখ, পড়িবার উপযুক্ত জিনিস থাকিলেই তাহা আদর করিয়া পড়িব আর পয়সা দিয়া কিনিব।

৬। শ্রীযুক্ত রবিবাবু সাধুভাষার দলের অসাধু ভাষা প্রয়োগের উল্লেখ করিয়াছেন। কথ্য ভাষার দলের অকথ্য ভাষা প্রয়োগের দৃষ্টান্তও বিরল নহে। এখন আমরা পাঠক সাধারণ, ইহাদের দুই দলই চুপ করিলে বাঁচি। কাণ ঝালাপালা হইয়া গিয়াছে। ভাষার রূপটা কথার জোরে ঠিক করিবার চেষ্টা না করিয়া, কাজের দ্বারা তাহা করিবার সময় আসিয়াছে। কালে কথ্য এবং লেখ্য ভাষা মিলিয়া যাইয়া সেই মিলিত ভাষা সাহিত্যে চলিবে, এবং কাজেই দুই দলেরই জয় হইবে। শান্তিপ্রিয়ের পরামর্শ এই যে, রাতারাতি জয়ের আশাটা পরিত্যাগ করিলেই অনর্থক বাকবিতণ্ডা কমিয়া যায় এবং দেশ জুড়ায়।

৭। পরিশেষে বানর গড়িবার কথাটা যে রবিবাবু তুলিয়াছেন, তাহাও উল্লেখযোগ্য। চৌধুরী মহাশয় নিজের লেখা এবং শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়দের লেখা উল্টাইয়া তুলনা করিয়া দেখিলে পারেন যে কোনটা বেশী "কথ্য"।

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী।
ঢাকা।

মন্তব্য।

——:০:——

ভট্টশালী মহাশয় এই প্রবন্ধের সংলগ্ন চিঠিতে লিখেছেন :—

"ভাষার সম্বন্ধে আমার বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠাইলাম। সম্পাদককেও রেয়াৎ দেওয়া হয় নাই"।—

সম্পাদককে রেয়াৎ করা হয়নি বলেই এ প্রবন্ধটি "পত্রিকায় স্থানদান" কর্‌তে বাধ্য হলুম। নচেৎ লেখক এ লেখায় ভাষা ও ভাবের যে উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় দিয়েছেন, তা পাঠকসমাজের কাছ-থেকে চেপে রাখতুম। ভট্টশালী মহাশয়ের বক্তব্য "স্থীরধীর" হতে পারে, কিন্তু তাঁর বলবার ভঙ্গীটির ভিতর পরিচয় পাওয়া যায় শুধু অস্থিরতা ও অধীরতার। "বক্তব্য লিপিবদ্ধ" করবার যে তাঁর তর সয়নি, তার প্রমাণ তাঁর লিপিচাতুরি। লেখকবিশেষের হাতে সাধু-ভাষা যে কত সহজে অশুদ্ধভাষা হয়ে ওঠে,—এ প্রবন্ধটি তার একটি পয়লা নম্বরের নমুনা। বানান ও ব্যাকরণের উপর ভট্টশালী মহাশয় যে স্বেচ্ছামত অত্যাচার করেছেন,—তার পরিচয় পাঠক এ প্রবন্ধের অনেক স্থলে পাবেন, কেননা পাছে ভট্টশালী মহোদয়ের প্রবন্ধের শুচিতা নষ্ট হয়, সেই ভয়ে আমি তার উপর হস্তক্ষেপ করিনি। "কথ্যভাষায়" যাই হোক, "লেখ্যভাষায়" যে ক্রিয়াপদের সঙ্গে বাকী পদগুলির অন্বয় হওয়া দরকার,—এ বিশ্বাস সম্ভবত ভট্টশালী মহাশয়ের নেই, নচেৎ নিম্নোদ্ধৃত বাক্যগুলির গড়ন অন্যরূপ হত।

"কিছু বলিবার ইচ্ছা বা প্রয়াস হয় নাই"।

"ঠিক জিনিসটি পাইবামাত্র সমস্ত কোলাহল অতিক্রম করিয়া আনন্দধ্বনি উঠিবে।"—

"তাই মনে রাখিয়া এই জাতীয় প্রবন্ধ পড়িয়া কোনটাকে অবহেলার যোগ্য মনে হইয়াছে, কোনটা আবার শুধুই বিদ্রোহ ও ক্ষোভ জাগাইয়াছে, কিন্তু একটায়ও বিচলিত করিতে পারে নাই"।—

"চৌধুরী মহাশয় নিজের লেখা এবং শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়দের লেখা উল্টাইয়া তুলনা করিয়া দেখিলে পারেন যে কোনটা বেশী "কথ্য"।—

পাঠকমণ্ডলী ভট্টশালী মহাশয়ের লেখা না উল্টেও এমনি সোজা-সুজি ভাবে দেখ্‌ল দেখতে পাবেন যে, এ লেখা অতুলনীয়। ভট্টশালী মহাশয়ের স্বহস্তরচিত বাক্যগুলির অন্তর্ভূত অনেক পদই স্ব স্ব প্রধান, এবং পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধশূন্য। হইয়া করিয়া প্রভৃতি, ক্রিয়াপদের সাধুরূপ হতে পারে, কিন্তু তাদের উক্তরূপ ব্যবহার সাধুব্যবহার নয়। অসমাপিকা ক্রিয়াকে এ ভাবে সমাপন করায় শুধু ব্যাকরণ নয়, লজিকেরও মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেওয়া হয়। ফরাসী দার্শনিক Bergson বলেন যে, মানুষ ছাড়া অপর জীবের মন থাকতে পারে, কিন্তু সে মনে subject, object এবং Predicate-এর সম্বন্ধজ্ঞান নেই; ও জ্ঞান যে কোন কোন মানুষেরও নেই, তার ভূরি ভূরি প্রমাণ এই প্রবন্ধ থেকেই উদ্ধার করা যায়।

ভট্টশালী মহাশয় "কয়েকটা" "সূত্রাকারে" এই ভাষার তর্কের চূড়ান্ত মীমাংসা করে দিয়েছেন। কিন্তু "এই বিষয়ে" তাঁর "বক্তব্য এতই অল্প," যে এক্ষেত্রে অতগুলি "সূত্রাকারের" দরকার ছিলনা—

একটিতেই কাজ চলে যেত। তাঁর সপ্ত "সূত্রাকারের" "অদলবদল চুয়াইয়া যে সার বাহির হইতেছে" সে এই ঃ—

"ধীরে ধীরে লিখিত ও কথিত ভাষার ব্যবধান কমিয়া আসিতেছে এবং কালে উভয়ে মিলিত হইয়া আদর্শ ভাষার সৃষ্টি হইবে,.....এই ভাষা যখন গড়িয়া উঠিবে তখন কাহাকেও ইহা গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিতে হইবে না। সকলে নিজের অজ্ঞাতসারে ইহা আপনা হইতে গ্রহণ করিবে"।—

অর্থাৎ অবস্থার গুণে কালক্রমে যা আপনাহতেই হবে, তা হবে, —তার জন্য মানুষের কোনও ভাবনার আবশ্যক নেই। সাহিত্য জগতেও মানুষের মনের কোনও কাজ নেই, কেননা যা "নিজের অজ্ঞাতসারে" হয়, তাই গ্রাহ্য—জ্ঞাতসারে কিছু করবার চেষ্টা করাটাই অকর্ত্তব্য।—দেশসুদ্ধ লোককে অজ্ঞান করে ফেল্‌তে পার্‌লে যে, তর্কবিতর্ক বিচার বিবেচনার কোনই বালাই থাকে না, তাতে আর সন্দেহ কি?—এবং তাতে করে, যাঁদের "মনে একটা সনাতন জড়তা" আছে, তাঁরা নির্ব্বিবাদে সেই জড়তার সনাতনত্ব রক্ষা কর্‌তে পারেন। —কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, মানুষের মন জড়পদার্থ নয়, সুতরাং জড়বস্তুর মত তা নিষ্ক্রিয় থাক্‌তে পারে না;—এবং মানুষ উদ্ভিদও নয়, যে সে শুধু পারিপার্শ্বিক অবস্থার বলে, কালক্রমে "নিজের অজ্ঞাত-সারে" ধীরে ধীরে বেড়ে উঠে তার স্বাভাবিক পরিণতি লাভ কর্‌বে। তবে মানুষ সচেতন পদার্থ হলেও, মানুষের মনে—ইংরাজীতে যাকে বলে inertia এবং সংস্কৃতে তমোগুণ—সেই জড়ধর্ম্ম আছে বলেই, সে মনকে ঈষৎ অগ্রসর কর্‌তে হলেও তার উপর তর্কবিতর্কের প্রবল ধাক্কা দেওয়া আবশ্যক।—এ সত্য এতই প্রত্যক্ষ যে, সজ্ঞানে তা উপেক্ষা করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। এই সহজ সত্যটি যে তাঁর

চোখে পড়ে নি, তার কারণ ভট্টশালী মহাশয় নিজেই নির্দ্দেশ করেছেন। তাঁর মতে ঃ—

"আপনার মতের উপর আপনার পুত্রের চেয়ে কম মায়া থাকে না, এবং এই দুর্ব্বলতা বিতর্ককালে তীক্ষ্ণধী ন্যায়পর ব্যক্তির বিচারবুদ্ধিকে পর্য্যন্ত অল্পাধিক মেঘাবৃত করিয়া রাখে।"—

কথাটা অবশ্য সম্পূর্ণ সত্য নয়। যে মত মানুষে বিচারবুদ্ধির সাহায্যে গড়ে তোলে, সেই মতই যথার্থ তার "আপনার মত"। বিচারবুদ্ধি যে মতের সৃষ্টির কারণ, বিচারবুদ্ধিই তার স্থিতিরও কারণ। অপর পক্ষে, যে মত হচ্ছে আসলে পড়ে-পাওয়া,—যে মত মানুষে অজ্ঞাতসারে অতএব নির্ব্বিচারে আত্মসাৎ করে,—তার রক্ষার জন্য বিচারবুদ্ধিকে মেঘমুক্ত করবার কোনই প্রয়োজন নেই,—"সনাতন জড়তাই" যথেষ্ট।—তা ছাড়া মানুষের কাছে পড়ে-পাওয়া জিনিসের মূল্যও একটু বেশী; এ ক্ষেত্রে চৌদ্দ আনা যে ষোল আনা হিসেবে গণ্য হয়, সে কথা ত লোকমুখেই শোনা যায়। এবং পড়ে-পাওয়া জিনিসের মূল্য বেশী বলে, মানুষের তার প্রতি মমতাও বেশী। এই কারণেই সে বস্তুর উপর কেউ হস্তক্ষেপ করলে লোকে—বিচার নয়, বিবাদ করতে প্রস্তুত হয়।

ভট্টশালী মহাশয় এ ক্ষেত্রে যে, বিচার নয় বিবাদ করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন—তার প্রমাণ, তিনি আমাদের সকল কথা মেনে নিয়েও তার প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করেছেন! সম্ভবত আমাদের মতটা মেনে নিতে বাধ্য হওয়াটাই তাঁর অক্রোশের কারণ হয়েছে। তিনি লিখেছেন ঃ—

"ক্রিয়াপদের গঠনে রাজধানীর প্রভাব সুস্পষ্ট থাকা অনিবার্য্য।"—

এর পর জিজ্ঞাসা করি, আমার সঙ্গে তাঁর মতের প্রভেদটা কোথায়? সম্ভবত এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলবেন যে, "যা অনিবার্য্য, তা নিবারণ করবার চেষ্টা করাটাই লেখকদের কর্ত্তব্য। কেননা লেখ্যর সঙ্গে একাকার কথ্য "ভাষা এখনও গড়িয়া উঠে নাই"। ভট্টশালী মহাশয়ের মতে সে ভাষা গড়ে উঠলে, তা আদর্শ ভাষা হবে। তথাস্তু। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, লেখকেরা যদি কথ্য-ভাষাকে লেখায় স্থান না দেন, তাহলে কি উপায়েও দুই ভাষার একীকরণ সম্ভব হবে?—এ প্রশ্নের এক উত্তর আছে—আপনা-আপনি। "সনাতন জড়তা" থেকে কিছুই যে আপনা-আপনি জন্মে না, এ কথা বলা বাহুল্য।

ভট্টশালী মহাশয় বলেছেন যে, শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দাস গুপ্তের প্রবন্ধটিকে পত্রিকায় স্থান দান করে আমি সুরুচির পরিচয় দিই নি।—ও প্রবন্ধের ভিতর যে কি কুরুচি আছে, তা আমি এখনও বুঝতে পারছি নে।—তবে ভট্টশালী মহাশয়ের সুরুচির জ্ঞান যে ঈষৎ অসাধারণ, তার পরিচয় তাঁর আগাগোড়া প্রবন্ধেই পাওয়া যায়।

পাঠকমাত্রেই দেখতে পাবেন, এ প্রবন্ধে ভট্টশালী মহাশয় কি "ভট্টতা", কি শালীনতা,—এ দুই গুণের কোনটারই পরিচয় দেন নি।

সম্পাদক।

———